রূপকথার ঝুড়ি
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রূপকথার ঝুড়ি

রূপকথার ঝুড়ি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান

সূচীপত্র

কথা কওয়া

এক ছিল গাঁ। সেখান থেকে একটু গেলেই আক্রা শহর।

সেই গাঁয়ের এক চাষী একদিন গেছে তার ক্ষেতে রাঙা-আলু তুলতে। সওদা নিয়ে হাটে যাবে সে বেচতে।

যেই না মাটি খোঁড়া, অমনি এক রাঙা-আলু কট্ কট্ ক'রে বলে উঠল, 'আচ্ছা লোক তো দেখছি! আগাছা নিড়ানোর বেলায় ঢুঁ ঢুঁ। আর আজ এসেছেন একেবারে খোন্তা কোদাল নিয়ে। যাও যাও, কেটে পড়ো।'

কথাটা কানে যেতে লোকটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে এদিক-ওদিক তাকায়। ওর গরুটা কাছাকাছি ব'সে জাবর কাটছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটা তাকে জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁ রে, তুই কিছু বললি?'

গরুটা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। নিজের মনে জাবর কেটে যেতে লাগল।

হঠাৎ পাশ থেকে তার কুকুরটা ফোড়ন কাটল, 'গরু কেন বলবে? বলেছে তোমার ঐ রাঙা-আলু। ও তোমাকে কেটে পড়তে বলেছে।'

কুকুরটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে চাষীর হাড়পিত্তি জ্বলে উঠল।

'দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।' রেগে কাঁই হয়ে ওকে লাঠিপেটা করবে ব'লে কাটারি দিয়ে এক কোপে গাছের একটা ডাল সে কেটে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে গাছটা ফোঁস করে উঠল, 'ডালটা ফেলে দাও ব'লে দিচ্ছি।'

কথা শুনে লোকটা তো থ'। দূর-ছাই ক'রে যেই ডালটা ছুঁড়ে ফেলতে গেছে, অমনি সেই কাটা ডালটা ব'লে উঠল, 'ছুঁড়ো না, ছুঁড়ো না। আস্তে ক'রে নামিয়ে রাখো।'

শুনে আলতোভাবে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর ডালটা সে নামিয়ে রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চাঁইটা ফট্ ক'রে ব'লে উঠল, 'সরাও বলছি, সরাও।'

লোকটার তখন ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচির অবস্থা। পড়ি-মরি ক'রে সেখান থেকে দে-দৌড় দে-দৌড়। গাঁয়ের পথ দিয়ে ঠিক সেই সময় মাছ ধরার জাল হাতে যাচ্ছিল এক জেলে। চাষীকে দেখে সে জিগ্যেস করল, 'কী হে, তিড়িং-বিড়িং ক'রে অত ছুটছ কেন?'

চাষী বলল, 'ছুটছি কি সাধে? রাঙা-আলু বলে কিনা, কেটে পড়ো। কুকুর বলে, রাঙা-আলুর কথা শোনো। কুকুরটাকে পিটতে গেলে গাছ বলে, ডালটা ফেলে দাও। গাছের ডাল বলে, আস্তে ক'রে রাখো। পাথরের চাঁই বলে, ডালটা সরাও।'

শুনে মাছ ধরার জাল হাতে জেলে বলে, 'ও হরি! এতেই এত ভয়?'

এমন সময় মাছ ধরার জালটা ব'লে উঠল, 'তা পাথরের চাঁই থেকে ডালটা সরানো হয়েছিল তো?'

শুনে সেই জেলে 'এই সেরেছে' ব'লে মাছ ধরার জাল মাটিতে ফেলে দিয়ে চাষীর সঙ্গে মিলে দে-দৌড়। যেতে যেতে কাপড়ের বস্তা মাথায় এক তাঁতীর সঙ্গে রাস্তায় দুজনের দেখা।

তাঁতী জিগ্যেস করল, 'অমন হন্তদন্ত হয়ে ছোটার কী কারণ?'

চাষী জবাব দেয় : 'রাঙা-আলু বলে কিনা, কেটে পড়ো। কুকুর বলল, রাঙা-আলুর কথা শোনো। গাছ বলল, লাঠি ফেলে দাও। গাছের ডাল বলল, আস্তে ক'রে রাখো। পাথরের চাঁই বলল, সরিয়ে নাও।'

সেই সঙ্গে জেলে জুড়ল : 'আর মাছ ধরার জাল বলে কিনা, ডালটা সরানো হয়েছিল তো ?'

শুনে তাঁতী বলল, 'তা এতে অত ঘাবড়ানোর কী আছে ?'

কাপড়ের বস্তাটা ফস্ ক'রে ব'লে উঠল, 'আছে বৈকি ! তোমার হলে তুমিও ছুট্ লাগাতে।'

তাঁতী তখন 'এই সেরেছে' ব'লে কাপড়ের বস্তা ফেলে দিয়ে অন্য তুজনের সঙ্গে দে-দৌড়।

তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে তারা এক নদীর ধারে এসে পৌঁছুল।

ঠিক সেই সময় নদীতে একজন স্নান করছিল। তার সঙ্গে ওদের দেখা। ওদের সে জিগ্যেস করল, 'তোমাদের ষাঁড়ে তাড়া করেছে নাকি?'

চাষী বলে, 'তবে বলি শোনো। রাঙা-আলু বলে কিনা, কেটে পড়ো। কুকুর বলে, রাঙা-আলুর কথা শোনো। গাছ বলে, লাঠি ফেলে দাও। ডাল বলে, আস্তে ক'রে রাখো। পাথরের চাঁই বলে, সরিয়ে নাও।'

জেলে বলে, 'আর আমার মাছ ধরার জালটা বলল, সরিয়ে নিয়েছ তো?'

তাঁতী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার কাপড়ের বস্তাটা বলল, তুমিও ছুট লাগাবে।'

শুনে নদীর জলে গা ডোবানো লোকটা বলল, 'ছি, ছি! এর জন্যে তোমরা ছুটছ?'

অমনি নদী কলকলিয়ে ব'লে উঠল, 'তোমার অমন অবস্থা হলে, তুমি কী করতে, বাছাধন?'

যেই না বলা, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠে ভিজে কাপড়ে লোকটা ওদের সঙ্গে দে-ছুট। তারপর ছুটতে ছুটতে তারা এসে গাঁয়ের মোড়লের বাড়িতে পোঁছুল। মোড়লের চাকরবাকর কাঠের চৌকি পেতে দিল। তাতে মোড়ল এসে বসল। তখন চাষী, জেলে, তাঁতী আর ভিজে কাপড়ে সেই লোকটা তাদের মুশকিলের কথা বলল।

চাষী তার হাত পা নেড়ে বলল, 'বাগানে গিয়েছিলাম রাঙা-আলু তুলতে। সবই দেখি কথার ঝুড়ি। রাঙা-আলু বলল, কেটে পড়ো। কুকুর বলল, রাঙা-আলুর কথা শোনো। গাছ বলল, ডালটা ফেলে দাও। কাটা ডাল বলল, খুব আস্তে। পাথরের চাঁই বলল, সরিয়ে নাও।'

জেলে বলল, 'মাছ ধরার জাল জানতে চাইল, সরিয়ে নিয়েছ তো?'

তাঁতী বলল, 'কাপড়ের বস্তা বলে কিনা, তুমিও ছুট লাগাবে।'

ভিজে কাপড়ে লোকটা বলল, 'নদীও সেই একই কথা বলল।'

মোড়ল গালে হাত দিয়ে ব'সে সব শুনল। তারপর চোখ দুটো পাকিয়ে বলল, 'যত সব আষাঢ়ে গপ্প। চলে যাও যে যার কাজে। ফাঁকি দিয়েছ কি, ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেব।'

অগত্যা ওদের চলে যেতে হল। মোড়ল মাথা নেড়ে বিড় বিড় ক'রে বলল, 'এইসব আহাম্মকদের জন্যেই সমাজটা গোল্লায় গেল।'

হঠাৎ কাঠের চৌকিটা ব'লে উঠল, 'কী সব উদ্ভুট্টে কাণ্ড! রাঙা-আলু কথা কইছে, ভাবা যায়?'

কাঁকড়া দা চাং

ভিয়েতনামের মানুষ আজও দা চাং-কে ভোলে নি।

যদি জিগ্যেস করো, 'কে দা-চাং?' সবাই একবাক্যে বলবে, 'সেই যে সেই সেকালে বনে শিকার করে বেড়াত! সেই কাঁকড়া দা-চাং।' সেই সঙ্গে তারা দুঃখু ক'রে বলবে, 'আহা, বেচারা মনের দুঃখে মারা গেল। পরে সে কাঁকড়া হয়ে জন্মায়।'

পৃথিবীতে কাঁকড়ার মতন করিতকর্মা, খাটিয়ে জীব আর দুটো নেই। কোনো কাজেই তার ভয়ডর ছিল না। পারুক না পারুক এক মনে সে সমানে কাজ করে যেত।

রাত পোহালেই দা-চাং বেরিয়ে পড়ত শিকারে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। একটা খোঁদল ছিল, সেখানে সে তার শিকারের পশুপাখিগুলো জমা ক'রে রেখে দিত।

এই খোঁদলের কাছেই থাকত দুটো ডোরাকাটা সাপ। ডোরা-কাটা সাপ দুটোকে দা-চাং কিচ্ছু বলত না। সাপ দুটোও তার জন্যে ওর খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল।

রোজ শিকারে বেরোবার আগে দা-চাং সাপ দুটোকে ডেকে

ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলা ক'রে তারপর ওদের খাইয়ে-দাইয়ে বনে চলে যেত।

ওদের সঙ্গে খেলা করা ছিল দা-চাঙের রোজকার নেশা।

একদিন সকালে সাপ দুটোকে ডাকতে গিয়ে দা-চাং শুনতে পেল প্রচণ্ড ফোঁসফাঁস ঝটাপটি দাপাদাপির আওয়াজ। এগিয়ে গিয়ে দেখে একটা বিশাল হল্‌দে সাপ ডোরাকাটা সাপ দুটোকে জাপ্‌টে ধরে পিষে মারবার চেষ্টা করছে।

দা-চাং সঙ্গে সঙ্গে হল্‌দে সাপটার গায়ে এমনভাবে তীরের ফলা বিঁধিয়ে দিল যে, বাপ্‌-রে মা-রে ডাক ছেড়ে সে পালিয়ে গেল।

ডোরাকাটা সাপ দুটোর কাছে গিয়ে দা-চাং দেখল, একটি অনেক আগেই অক্কা পেয়েছে এবং আরেকটিও মরো-মরো।

দেখে দা-চাঙের যে কী মন খারাপ হল বলার নয়। মুমূর্ষু সাপটিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে তার ক্ষতবিক্ষত শরীরে সে লতাপাতা শেকড়বাকড় বেঁধে দিল। তারপর মরা সাপটিকে একটা গর্তে শুইয়ে দিয়ে মাটিচাপা দিল।

দা-চাং সেদিনও শিকারে গেল বটে কিন্তু মন খারাপ থাকায় শিকারে তেমন সুবিধে করতে পারল না। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে এসে দা-চাং খেয়েদেয়ে যখন ঘুমোতে যাবে ভাবছে, সেই সময় হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির এক দৈত্য।

দৈত্য বলল, 'দা-চাং, তুমি আমাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। আমার বউকে মাটিতে গোর দিয়েছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে সামান্য একটা জিনিস আমি দিতে চাই। তুমি নিয়ে আমাকে ধন্য করো।'

এই ব'লে সর্পমূর্তি ধারণ ক'রে মুখ থেকে বার ক'রে আনল একটা মণি। সেই মণিমাণিক্যের আলোয় আলো হল সারা ঘর। দেখে দা-চাঙের কেমন যেন ভিরমি লেগে গেল।

খানিক পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে মেঝে থেকে মণিটা সে কুড়িয়ে নিল।

দা-চাং জানত সাপের মণি সঙ্গে থাকলে জীবজন্তুদের ভাষা বোঝা যায়।

পরদিন সাপের মণি সঙ্গে নিয়ে দা-চাং বনে এল। এসে দেখে গাছের মাথায় বসে আছে এক কাক।

হঠাৎ সে শুনতে পেল কাকটা বলছে :

'দক্ষিণে যা ত্বশো পা।
সামনে হরিণ কী শোভা॥'

দক্ষিণে ত্বশো পা এগিয়ে যেতেই দা-চাং হরিণটাকে ঠিক সামনে পেয়ে গেল। তাকে মেরে ঝুলিতে পুরতে যাবে, এমন সময় শুনল কাক বলছে :

'আমাকে কিছু বখশিস।
ভুলিস নে কো, ঠিক দিস॥'

দা-চাং খুশি হয়েই বলল :

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।
সেটুকু বুদ্ধি ঘটে কি নেই॥
দয়া ক'রে বলো, কী দস্তুরী ?'

কাক বলল :

'জীবজন্তুর নাড়িভুঁড়ি॥'

দা-চাং হরিণটাকে কেটে নিজের জন্যে চামড়া আর মাংস রেখে কাককে নাড়িভুঁড়ি বখশিস দিল। কাক তাতে মহাখুশি হল।

পরদিনও সেই একই ব্যাপার ঘটল। দা-চাংকে এইভাবে রোজই কাক শিকারের হদিশ দেয় আর তার বদলে নাড়িভুঁড়ি বখশিস নেয়।

এমনি ক'রে দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

একদিন হল কি, নাড়িভুঁড়ি নিয়ে দা-চাং কাকের কাছে গিয়ে দেখল কোথায় যেন সে কাজে বেরিয়ে গেছে। দা-চাং তখন তার জন্যে আর অপেক্ষা না ক'রে, রোজ যেখানে নাড়িভুঁড়ি থাকে সেই-খানে পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে, চামড়া আর মাংস নিয়ে নিজের

বাড়িতে চলে গেল।

কেউ বোধহয় সেটা লক্ষ্য ক'রে থাকবে। কেননা দা-চাং চলে যেতেই কেউ বোধহয় সেই ফাঁকে নাড়িভুঁড়িগুলো চুরি ক'রে নিয়েছিল।

এদিকে কাক এসে নাড়িভুঁড়ি না পেয়ে বেজায় খাপ্পা হল। কী, লোকটার এত বড় আস্পর্ধা!

কাক ওর বাড়ি বয়ে গিয়ে দা-চাংকে যাচ্ছেতাই ক'রে অপমান করল। দা-চাং যত বলে কাকের জন্যে নাড়িভুঁড়ি সে রেখে এসেছে, কাক কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলে, 'কথার খেলাপ ক'রে আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। মিথ্যুক কাঁহাকার!'

কিছুতেই বিশ্বাস করাতে না পেরে শেষকালে দা-চাংও আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। রেগে গিয়ে ধনুক তুলে কাকটাকে একটা তীর ছুঁড়ে মারল।

কাক খুব তুখোড়। ছোঁড়া তীরটাকে খপ্ ক'রে ঠোঁট দিয়ে সে লুফে নিল। তারপর একদিন সোজা চলে গেল রাজার দরবারে। গিয়ে বলল, 'হুজুর, আপনার প্রজা দা-চাং তীর ছুঁড়ে একজন মানুষ মেরেছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'বটে!' ব'লে কোটালকে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিলেন তদন্ত করতে। তদন্ত ক'রে দেখা গেল বান-ভাসি একজন মরা লোকের বুকে দা-চাঙের নাম-লেখা তীর বিঁধে রয়েছে। এসব যে ঐ শয়তান কাকটারই কীর্তি কে আর তা জানছে!

তখন রাজার সেপাইরা গিয়ে দা-চাংকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে আনল। মানুষ মারার অভিযোগে দা-চাঙের হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

দা-চাং আর কী করবে। জেলখানায় থাকাটাই তার অদৃষ্ট ব'লে মেনে নিল।

এদিকে বন্দী দা-চাঙের কাণ্ড দেখে কোটালের তো দুদিনেই চক্ষু চড়কগাছ! লোকটা নিশ্চয় বদ্ধ পাগল। নইলে সারাক্ষণ কেউ নিজের

মনে বকবক করে আর অকারণে খিলখিল ক'রে হাসে !

অন্যরা যাই ভাবুক, দা-চাং কিন্তু মোটেই পাগল নয়। আসলে মশা মাছি পিঁপড়ে ছারপোকা — দিনরাত এদের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলে। তারা এমন এমন সব মজার কথা বলে যে, দা-চাং না হেসে পারে না। ওরা বলে কোন্ কয়েদীর রক্ত মিষ্টি, কার রক্ত তেতো, কার কতটা রক্ত খেলে পেট ভরে — এই সব। দা-চাং ওদের সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কি করে। এইভাবে দিব্যি ওর সময় কেটে যায়।

এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন দা-চাং শুনল ছুটি চড়াইয়ের মধ্যে কথা হচ্ছে। একজন হাসতে হাসতে বলছে :

'ঘুমোয় যখন পাহারাওলা।
উজাড় করি রাজার গোলা ॥'

তারপর ছুজনে মিলে সুর ক'রে গায় :

'তাই রে নারে নাই রে।
গোলায় ধান আর নাই রে ॥'

শুনে দা-চাং তক্ষুনি কোটালের কানে কথাটা তুলল। কোটাল ভাবল, পাগল হোক ছাগল হোক — লোকটা যখন বলছে তখন উজিরকে জানিয়ে রাখা ভালো। উজির শুনে ভাবল, পাগল হোক ছাগল হোক — লোকটা যখন বলছে তখন একটু খোঁজ নেওয়া ভালো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, খবরটা সত্যি। তক্ষুনি পুরনো পাহারা-ওলাকে ভাগিয়ে দিয়ে নতুন পাহারাওলা বসানো হল। রাজার গোলায় নতুন যে ফসল উঠল আর তা খোয়া গেল না। কোটাল খুশি হল। উজিরের কাছে দা-চাঙের কদর বাড়ল।

এমনি ক'রে দিন যায়। একদিন দা-চাং দেখতে পেল পিঁপ্ড়েরা দল বেঁধে হন্ হন্ ক'রে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

দা-চাং জিগ্যেস করল :

'পিঁপ্ড়ে ভাই, পিঁপ্ড়ে ভাই।
হন্হনিয়ে যাও কোথায় ॥'

পিঁপ্ড়েরা যেতে যেতে বলে :

'ঝড় তুফান এলো ব'লে।
পালিয়ে তাই যাই চলে॥'

দা-চাং বলল কোটালকে। কোটাল বলল উজিরকে। সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যে ঢ্যাড়া পিটিয়ে তা জানিয়ে দেওয়া হল। তার ফলে, বান এসে যখন আছ্ড়ে পড়ল রাজাপ্রজা কারো গায়ে কোনো আঁচড় লাগল না।

বান নেমে গেলে রাজার কাছে দা-চাঙের ডাক পড়ল।

রাজা জিগ্যেস করলেন, 'কী ক'রে তুমি এসব জানতে পারো, হে?'

দা-চাং হাত জোড় ক'রে বলে, 'আজ্ঞে, আমি সমস্ত প্রাণীরই ভাষা বুঝি।'

এ কথা শুনে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যখন এত বড় একজন গুণীলোক, এবার থেকে তুমি হবে আমার পারিষদবর্গের একজন।'

যে-কথা সেই কাজ। কারাগার থেকে বেরিয়ে দা-চাং এবার স্থান পেল সটান রাজসভায়।

জীব-জানোয়াররা কী বলে, অনেক দিন থেকেই রাজার তা জানবার খুব ইচ্ছে। রাজা দেখলেন—যাক, এতদিনে একজনকে পাওয়া গেছে যে সত্যিই এসব জানেশোনে।

এরপর থেকে দা-চাংকে নিয়ে রাজা প্রায়ই সফরে বেরিয়ে পড়তেন। আশপাশে জীব-জানোয়ারদের যখনই কোনো কথা কানে আসত, দা-চাংকে জিগ্যেস ক'রে নিয়ে রাজা তা খেরোবাঁধানো লাল খাতায় টুকে রাখতেন। রাজামশাই বিশ্বাস করতেন, মানুষের কাছে জীব-জানোয়ারদের কথার বিশেষ মূল্য আছে। যে সব জিনিস মানুষের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, জীব-জানোয়ারদের কাছে তা ঠিক ধরা পড়ে। তাছাড়া মানুষের মত তারা কুচক্করে

আর হিংসুটে নয়। তাদের কাছ থেকে মানুষের অনেক কিছু শেখবার আছে।

এইভাবে রাজামশাই দা-চাংকে সঙ্গে নিয়ে সারা রাজ্য চষে বেড়ান।

ডাঙায় থেকে থেকে রাজা এক সময় হাঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, সমুদ্রেও তো নানা প্রাণী আছে। তাদের কথাও শোনা উচিত।

এই ভেবে দা-চাংকে নিয়ে রাজামশাই সেবার বেরোলেন সমুদ্র-যাত্রায়। একেকটি মাছ দেখেন আর দা-চাং মারফত তার সঙ্গে কথা জুড়ে দেন। ওদের কাছ থেকে তিনি কত কী যে জানতে পারেন তা ব'লে শেষ করা যায় না।

একদিন সমুদ্রে বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছে। নৌকোর পালে শোনা যাচ্ছে পৎ পৎ শব্দ। পাড়ের কাছাকাছি জলে ঘাই দিতে দিতে একদল রাঘববোয়াল সুর ক'রে কী যেন গাইছিল।

ভালো ক'রে শোনবার জন্যে দা-চাং জলের কাছে মুখ নিয়ে এসে কান খাড়া ক'রে রইল।

একটু পরেই ও বুঝতে পারল, মাছগুলো জলের ভেতর লটর পটর করতে করতে গাইছে:

'ওলট পালট তুলোট মেঘে
টগবগিয়ে প্রবল বেগে
আকাশ জোড়া
ও কার ঘোড়া
ছুটছে যেন বেজায় রেগে
চিঁ হিঁ হিঁহিঁ চিঁ হিঁ হিঁহিঁ
দেবে কে তার জবাবদিহি…'

শুনে দা-চাং অসাবধান হয়ে যেই না হো হো ক'রে হেসে উঠেছে অমনি তার গালে-রাখা সাপের মণিটা ঝপাং ক'রে জলে পড়ে গেল।

মণিটা উদ্ধারের আশায় সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল দা-চাং। কিন্তু এ তো আর ডোবাপুকুর নয়, নদীনালাও নয়। এ হল সমুদ্দুর। জলের নিচে শুধু বালি আর বালি।

দা-চাং খালি হাতে জল থেকে যখন উঠে এল, তার মুখ শুকিয়ে আম্‌সি।

রাজামশাইও মণিটা উদ্ধারের জন্যে কম চেষ্টা করলেন না। সাপের মণি না হলে জীব-জানোয়ারের জগতে দা-চাং যে একেবারে বোবা-কালা হয়ে পড়বে। তখন রাজারও তো সেখান থেকে জ্ঞান অর্জনের কোনো উপায় থাকবে না।

যে জায়গায় মণি পড়েছিল, রাজার হুকুমে সে জায়গাটায় একটা গণ্ডী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তারপর যত রাজ্যের ডুবুরীদের
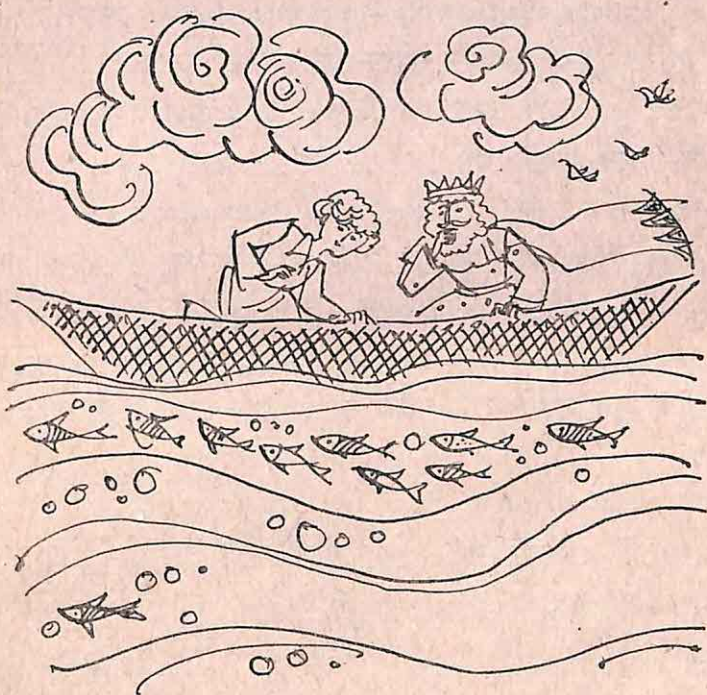
ভাড়া ক'রে এনে সেখানে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে বলা হল। দিনের পর দিন গেল। হপ্তার পর হপ্তা গেল। কোথায় মণি কোথায় কী!

শেষকালে রাজামশাই হাল ছেড়ে দিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে চলে গেলেন।

কিন্তু দা-চাঙের গোঁ, সাপের মণি না নিয়ে সে নড়বে না।

দলে দলে লোক নিয়ে এসে সে সমুদ্রমন্থন শুরু ক'রে দিল। কত যে বালি উঠল তার ঠিকঠিকানা নেই। জলবালি যত সরায় ততই আশপাশের জলবালি এসে খালি জায়গা ভরাট ক'রে দেয়। লোকজনেরা বুঝতে পারল, সাপের মণি সেখানে খুঁজে পাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। আস্তে আস্তে সবাই একদিন সেখান থেকে কেটে পড়ল।

দা-চাং তখন একেবারে একা। তবু সে হাল ছাড়ল না। জল-বালি তুলে সমানে হারানো মণি ফিরে পাবার চেষ্টা করে চলল।

কিন্তু কিছুই তো আর অনন্তকাল ধ'রে চলতে পারে না।

দা-চাঙের অনেক বয়স হল। তারপর একদিন সমুদ্রের বালি সরাতে সরাতে মারাও গেল।

লোকে বলে, দা-চাং মরে গিয়ে নাকি কাঁকড়া হয়ে জন্মায়।

কাঁকড়া সেই থেকে সমুদ্রের বালিতে নাকি সাপের সেই মণিটা সমানে খুঁজে বেড়ায়।

তুমি যদি কখনও সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাও, দেখবে পাড়ের ওপর কে যেন মুঠো-মুঠো বালি তুলে ছোট ছোট ঢিপি বানিয়ে রেখেছে।

কে রেখেছে, জানো?

মনে নেই? বললাম যে—

কাঁকড়া দা-চাং।

বলীবর্দ

এক ছিল কৃষাণ আর এক কৃষাণী। তারা ছিল বিরাট ক্ষেতখামারের মালিক। পয়সাও ছিল অঢেল। কৃষাণ ফি বছরই নতুন নতুন চাষের জমি কিনত আর কৃষাণী কিনত হাঁসমুরগি।

এত যে ঐশ্বর্য, তবু তাদের সুখ ছিল না।

কৃষাণ বলত, 'আহা, যদি আমাদের একটা ছেলে থাকত তো বুড়ো বয়সে আমাদের দেখতে পারত। আমরা চোখ বুঁজলে আমাদের বিষয়সম্পত্তি সে-ই সব ভোগদখল করত।'

কৃষাণী বলত, 'আহা, যদি আমাদের একটা মেয়ে থাকত তো বুড়ো বয়সে সে-ই আমার এই হাঁসমুরগিগুলোকে দেখতে পারত। আমি চোখ বুঁজলে আমার সব গয়নাগাঁটি সোনাদানা তার হত।'

এই ব'লে দুজনেই থেকে থেকে চোখের জল ফেলত।

কিন্তু ভগবান তাদের কোনো ছেলেপুলে দিলেন না।

কৃষাণ আর কী করবে! মনের দুঃখে তার বউয়ের জন্যে একদিন গাঁয়ের হাট থেকে একটা চমৎকার বাছুর কিনে আনল। বাছুরটার ওপর দুজনেরই খুব মায়া পড়ে গেল।

বাছুরটা দেখতে যেমন সুন্দর, তার স্বভাবটাও তেমনি মধুর। কৃষাণ মাঠে গেলে ছুটতে ছুটতে তার পেছন পেছন যায়। কৃষাণী যখন রান্নাবান্না করে, জানলায় মুখ দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

কৃষাণ কৃষাণী আদর ক'রে তার নাম রাখল পিটার। গোয়ালঘরে না রেখে রাত্তিরে খড় পেতে তার শোয়ার ব্যবস্থা হল রান্নাঘরের পাশের একটা কামরায়। পিটার শুধু যে তাদের ভালবাসত, তাই নয় — তাকে দেখে মনে হত সে যেন সব কিছুই বোঝে।

কৃষাণী প্রায়ই কৃষাণকে বলত, 'পিটার কথা বলতে পারলে কী ভালোই যে হত। ওর কিন্তু চেষ্টা আছে। কিভাবে ও ঠোঁট নেড়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে দেখেছ তো?'

কৃষাণ ঘাড় নেড়ে সায় দিত। একদিন সে তার বউকে বলল, 'আচ্ছা, গির্জাদারকে একবার ব'লে দেখলে হয় না — ও যদি পিটারের মুখে বুলি ফোটাতে পারে? পিটার কথা বলতে শিখলে ওকে আমরা দিব্যি দত্তক নিতে পারি। তাহলে ও আমাদের ওয়ারিশ হতে পারবে।'

শুনে ওর বউ খুশি হয়ে বলে, 'ঠিক বলেছ। গির্জাদার খুব এলেমদার লোক। মুখ্যু বোকাদেরও যেভাবে ও লিখতে পড়তে শেখায়, তাতে অমন চালাকচতুর পিটারের মুখে বুলি ফোটানো তার পক্ষে আর শক্ত কাজ কী? হ্যাঁ, তুমি তাই করো। আজই রাত্তিরে গির্জাদারকে তুমি গিয়ে পাকড়াও করো।'

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে কৃষাণ সেইদিনই গির্জাদারের বাড়িতে গেল। তাকে খুশি করার জন্যে বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেল একটা নধরকান্তি রাজহাঁস। গির্জাদার ছিল মহা ধুরন্ধর লোক। রাজহাঁসটার কেমন ওজন সেটা পরখ ক'রে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, 'তারপর? কী মনে ক'রে?'

কৃষাণ তাকে পিটারের পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। শুনতে শুনতে গির্জাদারের পেট ফেটে হাসি আসার যোগাড়। কিন্তু তবু সে

প্রাণপণে তা চেপে গম্ভীর মুখে বলল, 'কাজটা বাপু, বড়ই কঠিন। তবে চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু একটা কথা। আর কেউ ঘুণাক্ষরেও যেন এ কথা জানতে না পারে। কেন না তাহলে এখানে তিষ্ঠানো আমার দায় হবে। সবাই তখন গরু-ছাগল কুকুর-বেড়াল নিয়ে এসে আমার দরজার ভিড় করবে। তাছাড়া পাদ্রীমশাইয়ের কানে গেলে আমার চাকরিটাও থাকবে না। পিটারের ব্যাপারে আমি রাজী হচ্ছি শুধু তোমরা নিঃসন্তান ব'লে। কিন্তু মনে রেখো, কাকপক্ষী যেন টের না পায়।'

কৃষাণ কথা দিল, এ ব্যাপারটা আর কেউ জানবে না।

গির্জাদার তবু গাঁইগুঁই করার ভাব দেখায়। বলে, 'তাছাড়া কী জানো, জানোয়ারের মুখে বুলি ফোটানো তো আর চাট্টিখানি কথা নয়? খরচও সাংঘাতিক। ঘড়ি ঘড়ি শহরে যেতে হবে, দামী দামী বইপত্তর কিনতে হবে। তোমার অবস্থা ভালো, জানি। তবে এ তো প্রায় হাতি পোষার খরচ। তুমি কি পারবে?'

এতে কৃষাণের আঁতে ঘা লাগল। এ তল্লাটে তার মত বড়লোক আছে কে? তাই একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল, 'যত টাকা লাগে আমি দেব। আপনি শুধু পিটারের মুখে বুলি ফুটিয়ে দিন, ব্যস্। কালকেই আপনাকে আমি হাজার টাকা দিয়ে যাব। কী, রাজী?'

গির্জাদার বলল, 'ঠিক আছে। টাকা আর বাছুর কালকেই তুমি এনে দাও। দেখি আমি কী করতে পারি।'

কৃষাণ পরদিনই পিটারকে নিয়ে এসে গির্জাদারের হাতে সঁপে দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে দিল এক হাজার টাকা।

অমন হৃষ্টপুষ্ট পিটারকে দেখা মাত্র গির্জাদারের জিভে জল এসে গিয়েছিল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে। আজ থেকেই ওকে তালিম দেওয়া শুরু করব।'

এক হপ্তা পর কৃষাণ আর কৃষাণী গির্জাদারের বাড়িতে এসে হাজির। কৃষাণী একবার পিটারকে চোখের দেখা দেখতে চায়।

পিটারকে কাছছাড়া ক'রে কৃষাণীর বেজায় মন খারাপ।

শুনে গির্জাদার জিভ কেটে বলে, 'ছি, ছি অমন কাজও ক'রো না। এসে পর্যন্ত বাড়ির জন্যে ও এমন হুতুশে হয়ে পড়েছিল যে, ওকে একবর্ণও কিছু শেখানো যায় নি। কাল থেকে দেখছি ও কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। তোমাদের দেখলেই আবার সব গোলমাল হয়ে যাবে। তাছাড়া, ওর জন্যে যে বইগুলো এনেছিলাম ওর পক্ষে একটু ভারী হয়ে যাচ্ছে। তাই অন্য রকমের কিছু বইপত্তর আনা দরকার। সময় হলে আমিই তোমাদের দেখা করে যেতে বলব।'

কৃষাণ বুঝল বইপত্রের জন্যে গির্জাদার আরও কিছু টাকা চায়। কাজেই গির্জাদারকে আরও হাজার টাকা দিয়ে বলল, 'পিটারকে আমাদের ভালবাসা জানাবেন।'

গির্জাদার বলল, 'সে আর বলতে।'

তারপর আবার এক হপ্তা পরে কৃষাণ কৃষাণী এসে হাজির।

কৃষাণের বউ জিগ্যেস করে, 'আমার পিটার সোনার কী খবর?'

'খুব ভালো। ওর বোল ফুটতে শুরু করেছে।'

'একবার নিয়ে আসুন, ওকে একটু দেখি।'

'উঁহু, এখনও সময় হয় নি। তোমাদের যেই দেখবে, অমনি সে বাড়ির জন্যে হুতুশে হয়ে পড়বে। আমার এত দিনের যে চেষ্টা, তখন সব মাটি হয়ে যাবে।'

'ইস্, কবে যে ওর মুখের কথা শুনতে পাবো? তা গির্জাদার মশাই, পিটার এখন কী কথা বলছে?'

'ও বলছে, ম'-ম' ম'-ম'।'

'তার মানে?'

বউকে থামিয়ে দিয়ে কৃষাণ বলে, 'বা রে, এও বুঝছ না? তার মানে মণ্ডা গো, মণ্ডা। পিটার মণ্ডা খেতে চাইছে।'

গির্জাদার একগাল হেসে বলে, 'ঠিক ধরেছ। ও মণ্ডা খেতে চাইছে।'

পরদিন পিটারের জন্যে কৃষাণ দু হাঁড়ি মণ্ডা দিয়ে গেল। গির্জাদার নিজে মণ্ডার খুব ভক্ত।

দশদিন পর কৃষাণ আবার এল পিটারকে দেখতে। গির্জাদার তাকে দেখেই ব'লে উঠল, 'ইস্, আরেকটু আগে এলে না? সারাদিন সমানে বকর বকর ক'রে এই একটু আগে ক্লান্ত হয়ে পিটার ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন কাঁচা ঘুম ভাঙালে ওর শরীর খারাপ হবে। আর দেখ, ওর জন্যে যা বই এনেছিলাম সব শেষ। আবার কিছু নতুন বই কিনতে হবে।'

কৃষাণ তাকে আরও এক হাজার টাকা দিল। মনে মনে সে একটু বিরক্তও হল। জলের মত সে শুধু টাকা ঢেলেই যাচ্ছে। কাজের কাজ কী হচ্ছে কে জানে? মুখে শুধু বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন। আমার বউ যে আর স্থির থাকতে পারছে না।'

এদিকে পিটার আর বাছুর নেই। ঘাড়েগর্দানে বেশ বলীবর্দ হয়ে উঠেছে। গির্জাদার এবার তাকে জবাই করবে ঠিক করল। তার যে কথা সেই কাজ।

গির্জাদার লোকটা ছিল একের নম্বরের শয়তান। তার ফলও ফলতে দেরি হল না। বছরখানেক পর চাকরিটা সে তো খোয়ালোই, এমন কি তার টাকাগুলোও একদিন খোয়া গেল।

পিটারকে মারবার পর গির্জাদার একদিন খুব সাজপোশাক ক'রে কৃষাণ-কৃষাণীর বাড়িতে গিয়ে উদয় হল। ওকে দেখে কৃষাণী জিগ্যেস করল, 'আমার পিটার কোথায়?'

'সে কি? পিটার এখানে আসে নি?' তারপর খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার ভাব দেখিয়ে গির্জাদার বলল, 'ও আমার সঙ্গে আসবে ব'লে বায়না ধরেছিল। বেরিয়ে এসে আমার হুঁশ হল রুমালটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। আমি ওকে বললাম, তুই এগো, আমি রুমাল নিয়ে এক্ষুণি আসছি। হা ভগবান, পিটার আসে নি?'

পিটারকে আর পাওয়াই গেল না। কৃষাণ-কৃষাণীর কী যে দুঃখ

হল তা বলার নয়। তাদের এতদিনের এত আশায় ছাই পড়ল। ওরা তো জানত না, গির্জাদার পিটারের মাংস আর মণ্ডা দিয়ে ভোজ খেয়েছে!

কিছুদিন পর গির্জাদার একদিন কাগজে খবর দেখল, 'পিটার বলীবর্দ' নামে একজন লোক কাছেই এক শহরে একটা দোকান খুলেছে। দেখামাত্র গির্জাদার মুচকি হেসে মনে মনে একটা মতলব এঁটে নিল।

তক্ষুনি সে ছুটে গেল কৃষাণ-কৃষাণীর খামারবাড়িতে। গিয়ে বলল, 'পিটারের খোঁজ মিলেছে, হে। এই দেখ। পিটার এখন শহরে দোকানদার হয়ে বসেছে।'

আনন্দে কৃষাণ-কৃষাণী কী করবে ভেবে পায় না।

কৃষাণী বলে, 'ওগো, তুমি এক্ষুণি শহরে চলে যাও। দোকানে ওর পুঁজিপাটার দরকার হবে। আমার এক মাসীর একটা দোকান ছিল। মাসী কেবলই বলত বেচাকেনায় তার টাকার দরকার।'

কৃষাণ চামড়ার একটা বড় থলিতে মোহর ভর্তি ক'রে তক্ষুণি শহরে রওনা হল। রাতভর হেঁটে যখন সে শহরটাতে পৌঁছুল তখন দিনের আলো সবে ফুটছে। চাঁদনী রাত ছিল তাই বাঁচোয়া। নইলে অন্ধকারে নির্ঘাত সে রাস্তা হারিয়ে ফেলত।

শহরে পা দিয়ে সোজা সে চলে গেল পিটার বলীবর্দের দোকানে। গির্জাদারই তাকে ঠিকানাটা দিয়েছিল।

কড়া নাড়তেই এসে দরজা খুলে দিল ছোট একটি মেয়ে। ও-বাড়িতে সে কাজ করে। মেয়েটি বলল যে, তার মনিব ওপরের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

কৃষাণ বলল, 'থাক্, থাক্। আমি গিয়ে ওকে তুলছি। আমি ওর বাবা।' এই ব'লে পা টিপে টিপে ওপরের ঘরে গিয়ে কৃষাণ তো দেখেই ওকে চিনতে পারল। সেই গাবদা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, চওড়া ঘাড়, কটা-কটা চুল। তখনও সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কৃষাণ দেখল — ছিল বলদ, হয়েছে মানুষ — এইটুকুই যা তফাত।

কৃষাণ সস্নেহে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'এই কুঁড়ের বাদ্‌শা। উঠে পড়্, উঠে পড়্। ছেলের এদিক নেই ওদিক আছে। আবার পালানো হয়েছিল।'

পিটার ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে দেখে এক অজানা অচেনা লোক তাকে কি সব ব'লে আদর করছে। ও ভাবল, নির্ঘাৎ কোনো পাগল লোক। ও জানত পাগলদের কখনও ঘাঁটাতে নেই। তাই কৃষাণ যা-ই বলে, পিটার হ্যাঁ-হুঁ ব'লে তাতেই সায় দেয়। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

কৃষাণ বলে, 'এই তো, এখন দিব্যি মানুষ হয়ে গিয়েছিস। গির্জাদারকে সাবাস দিতে হয়। এখন দেখে কে বলবে তুই আমাদের

S.C.E.R.T. W.B LIBRARY
Date 13.8.99
Accn. No. 9884
S.C.E.R.T. W.B. Library Calcutta

লক্ষ্মীগাইয়ের পেট থেকে পড়েছিলি ! নে চ'ল্, আমার সঙ্গে বাড়ি যাবি চল্ ।'

শুনে পিটারের পিলে চম্‌কে যায় । এ পাগল তো সহজে ছাড়বে না । ওকে নিরস্ত করার জন্যে পিটার বলে, 'আজ থাক্ । দোকানের কিছু ঝামেলা আছে । ক'দিন পরে যাব ।'

কৃষাণ বলে, 'দোকান করলে তার ঝামেলা তো থাকবেই । সেই জন্যেই তো আমি কিছু টাকা সঙ্গে ক'রে এনেছি । এই দেখ্ — ' ব'লে চামড়ার থলিটা উপুড় ক'রে মোহরগুলো মেঝের ওপর ঢেলে দেয় ।

অতগুলো টাকা দেখে পিটারের চোখ চক চক ক'রে ওঠে । ভয় করার বদলে কৃষাণকে ওর কেমন যেন ভালোই লাগতে থাকে । ও তখন বলে, 'আমার কাছে ক'দিন থেকে যান ।'

কৃষাণ বলে, 'তা বেশ, থাকব । কিন্তু আমাকে তুই বাবা ব'লে ডাকবি ।'

পিটার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে, 'তা তো বলতেই পারি । আমার মা-বাবা কেউ নেই ।'

কৃষাণ বলে, 'সে আর আমি জানি না ? তোর মা মারা যায় মাথায় বাজ প'ড়ে । তোর বাপকে আমি কশাইখানায় বেচে দিই । তোকে আমরাই বড় করি । আমরাই এখন তোর মা-বাবা । আমরা মরে গেলে আমাদের যা বিষয় সম্পত্তি সব তুই পাবি ।'

পিটার ভাবে, এতদিনে ডাক শুনে ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন । তাই পাগলের বেশে তিনি পাঠিয়েছেন এক উদ্ধারকর্তা । পুঁজির অভাবে শত চেষ্টা ক'রেও সে তার দোকানটাকে দাঁড় করাতে পারছিল না । এতদিন পর সেই সুযোগ পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না ।

ক'দিন খুব ফুর্তিতে কাটিয়ে পিটার-বলীবর্দকে নিয়ে কৃষাণ গাঁয়ে ফিরে গেল । কৃষাণী তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছে ভেবে

আহ্লাদে আটখানা হল। ওরা ধরে নিয়েছিল যে, পিটারের মানুষ হওয়ার পেছনে আসলে গির্জাদারেরই হাতযশ। তাই গির্জাদারকে ডেকে এনে কৃষাণ-কৃষাণী খুব আদর আপ্যায়ন করল। গির্জাদার এমন ভাব দেখাল যেন পিটারকে সত্যিই সে বলদ থেকে মানুষ করেছে।

কৃষাণ-কৃষাণী তাদের যথাসর্বস্ব পিটারকে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে দু এক বছর পরে গ্রামের বাস উঠিয়ে শহরে ছেলের কাছে চলে গেল। ততদিনে পিটারের দোকান আর ব্যবসাপাতি পুঁজির জোরে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। শহরে এক ডাকে সবাই পিটারকে চেনে।

এরপর কৃষাণ-কৃষাণী খুব ধুমধাম ক'রে ছেলের বিয়ে দিল। তারপর তাদের ঘর নাতিপুতিতে ভ'রে উঠল। মাঝে মাঝে ছুটিতে বুড়োবুড়ি তাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়। খোলা আকাশের নিচে তারা যখন খেলায় মেতে ওঠে, তখন বুড়িকে ডেকে বুড়ো বলে :

'দেখ, দেখ, নিজেরাই ওরা কেমন কথা বলতে শিখে গিয়েছে। মনে আছে, পিটারকে নিয়ে আমাদের কী দুর্ভোগ ? ওর মুখে বোল ফোটাতে কম সময় লেগেছে ? সেই জন্যে টাকাও খরচ হয়েছে জলের মত।'

বুড়ি বলে, 'টাকার কথা ছাড়ো তো। পিটারের মুখে বোল ফুটেছে, এই না আমাদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। আজ দেখ, ছেলে ছেলের-বউ নাতিপুতি নিয়ে আমাদের কী সুখের সংসার ! টাকা খরচ না করলে হত ?'

বুড়ো এক গাল হেসে বলে, 'না, তুমি ঠিকই বলেছ।'

চীনের পঞ্চপাণ্ডব

অনেক, অনেকদিন আগের কথা। চীনদেশে ছিল পাঁচ ভাই। পাঁচজনই দেখতে অবিকল এক। মার সঙ্গে তারা থাকে। বাড়ির কাছেই ছিল সমুদ্র।

বড় ভাই পহেলা। সে চোঁ চোঁ ক'রে গোটা দরিয়া গিলে ফেলতে পারত।

মেজো ভাই মাঝেলা। তার ঘাড় আর গলা ছিল লোহার।

সেজো ভাই সহেলা। সে নিজের খুশিমতন ঠ্যাং লম্বা করতে পারত।

ন' ভাই নওল। তাকে কিছুতেই আগুনে পোড়ানো যেত না।

ছোট ভাই পিছেলা। সে যতক্ষণ খুশি দম বন্ধ ক'রে থাকতে পারত।

রোজ যেই সকাল হত, বড় ভাই পহেলা চলে যেত মাছ ধরতে। জল হোক, ঝড় হোক—মাছ সে ধরবেই। আর কী সব মাছ! যেমনি খেতে ভালো, দেখতেও তেমনি। বাজারে নিয়ে যাওয়ামাত্র টপাটপ বিক্রি হয়ে যেত।

একদিন পহেলা বাজার থেকে ফিরছে, এমন সময় একটা পুঁচকে ছেলে এসে তাকে ধরল। বলল, 'কাল যখন মাছ ধরতে যাবেন, আমাকে একটু সঙ্গে নেবেন?'

বড় ভাই মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, ওসব চ্যাঁ ভ্যাঁ আমি সঙ্গে নিই না।'

কিন্তু ছেলেটা এমন ছিনে-জোঁকের মত লেগে রইল যে; শেষ পর্যন্ত পহেলা আর 'না' বলতে পারল না। বলল, 'নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে। যা বলব তোমাকে তা তক্ষুনি মেনে চলতে হবে।'

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মানবো বৈকি। নিশ্চয় মানবো।'

পরদিন রাত পোহাতেই দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে পৌঁছুল।

বড় ভাই পহেলা সেই পুঁচকে ছেলেটাকে পই পই ক'রে বলল, 'যা বলেছিলাম, মনে আছে তো? যেই তোমাকে আমি হাত নেড়ে উঠে আসতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি পাড়ে উঠে পড়বে।'

ছেলেটা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি হাত নাড়লেই অমনি উঠে আসব।'

তখন পহেলা চোঁ চোঁ ক'রে দরিয়ার সব জল খেয়ে ফেলল।

দরিয়ার তলায় তখন খল্‌বল্ খল্‌বল্ করছে রাজ্যের চকচকে ঝকঝকে মাছ। সে এক দেখার মতন দৃশ্য। তার মধ্যে পাথরের সব নুড়ি। রং বেরঙের ঝিনুক। আর কত যে ছত্রাক!

পুঁচকে ছেলেটা সেই সব দেখে কী যে খুশি হল বলার নয়। ছুটে ছুটে কোঁচড় ভ'রে সে কেবল নুড়ি, ঝিনুক আর ছত্রাক কুড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

বড় ভাই পহেলা এদিকে গোগ্রাসে দরিয়া গিলে কিছু মাছ ছালায় পুরে পাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করছে। অত বড় সমুদ্রটাকে পেটের মধ্যে ধরে রাখা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। দম নিক্‌লে যাচ্ছিল ব'লে পহেলা হাত নেড়ে ছেলেটাকে তক্ষুনি উঠে আসবার

জন্যে ইশারা করল। ছেলেটা ওর কথা কানেই নিল না। বরং ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে আরও দূরে চলে গিয়ে নেচে-কুঁদে বেড়াতে লাগল। পহেলা যত ওকে হাত নেড়ে ফিরে আসতে বলে, ততই ওকে মুখ ভেংচে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে দূরে চলে যায়।

এদিকে পহেলার অবস্থা কাহিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে দরিয়া। শেষকালে দরিয়াকে আর সে ধরে রাখতে পারল না। শুক্‌নো খাত এক মুহূর্তে কানায় কানায় জলে ভরে উঠল। আর সেই জলের মধ্যে পুঁচকে ছেলেটা দেখতে দেখতে তলিয়ে গেল।

পহেলা মন ভার ক'রে একা গ্রামে ফিরে এল। তার কথা আর কে শোনে? গাঁয়ের কোটাল তাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে কাজীর কাছে নিয়ে গেল। বিচারে ঠিক হল তার গর্দান যাবে।

যেদিন তার ফাঁসি হবে, সেইদিন ভোরে উঠে কাজীর কাছে পহেলা আর্জি জানাল:

'হুজুর, অনুমতি দেন তো বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে আসি।'

কাজী বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

বড় ভাই পহেলা তখন টুক ক'রে বাড়ি চলে গিয়ে তার জায়গায় মেজো ভাই মাঝেলাকে পাঠিয়ে দিল।

সেদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁ-সুদ্ধ লোক ফাঁসি দেখতে চকে এসে ভিড় করল। জল্লাদ খাঁড়া তুলে মাঝেলার ঘাড়ে সজোরে মারল এক কোপ। একগাল হেসে তড়াক ক'রে সে উঠে দাঁড়াল। তার ঘাড় তো লোহার। কাজেই কিছুতেই তার মুণ্ডু কাটা যায় না।

গাঁয়ের লোকে তখন রেগেমেগে বলল, 'মুণ্ডু যখন কাটা যাচ্ছে না, তখন ব্যাটাকে মাঝদরিয়ায় ডুবিয়ে মারো।'

যেদিন ওকে ডুবিয়ে মারার কথা, সেদিন ভোরে উঠে কাজীর কাছে মাঝেলা আর্জি জানাল:

'হুজুর, অনুমতি দেন তো বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে আসি।'

কাজী বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

মেজো ভাই মাঝেলা তখন টুক ক'রে বাড়ি চলে গিয়ে তার জায়গায় সেজো ভাই সহেলাকে পাঠিয়ে দিল।

সহেলাকে তখন একটা বালাম নৌকোয় চড়িয়ে মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ঝপাং ক'রে জলে ফেলে দেওয়া হল।

জলে পড়া মাত্র সহেলা তার ঠ্যাং দুটোকে টেনে এমন লম্বা ক'রে নিল যে পা দুটোকে সমুদ্রের তলায় ঠেকিয়ে সহজেই সে তার হাসি-হাসি মুখটাকে ঢেউয়ের ওপর ভাসিয়ে রাখতে পারল।

তাই দেখে গাঁয়ের লোকে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঠিক করল, ওকে এবার পুড়িয়ে মারা হবে।

যেদিন ওকে আগুনে পোড়ানোর কথা, সেদিন ভোরে উঠে কাজীর কাছে সহেলা আর্জি জানাল:

'হুজুর, অনুমতি দেন তো বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে আসি।'

কাজী বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

সেজো ভাই সহেলা তখন টুক্ ক'রে বাড়ি চলে গিয়ে তার ন'ভাই নওলকে পাঠিয়ে দিল।

নওলকে দড়িদড়া দিয়ে একটা খুঁটির গায়ে বাঁধা হল। তারপর গাঁ-সুদ্ধ লোকের সামনে তার চারদিকে কাঠ সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে আগুন। তার মধ্যে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে নওল বলতে লাগল, 'কী মজা! কী মজা!'

গাঁয়ের লোকে হাঁক দিয়ে বলল, 'আঁচ বাড়াও, আরও কাঠ আনো।'

কিন্তু সবই হল ভস্মে ঘি ঢালা। নওল সমানে বলতে লাগল, 'আঃ, কী আরাম!'

লোকে দেখল, এ তো মহা জ্বালা। লোকটাকে কিছুতেই নিকেশ করা যাচ্ছে না। তখন তারা ঠিক করল, মাটিচাপা দিয়ে রেখে দিলে তখন বাছাধন নির্ঘাৎ দমবন্ধ হয়ে মরবে।

যেদিন ওকে মাটিতে পুঁতবার কথা, সেদিন ভোরে উঠে কাজীর কাছে নওল আর্জি জানাল :

'হুজুর, অনুমতি দেন তো বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে আসি।'

কাজী বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ন' ভাই নওল তখন টুক্ করে বাড়ি চলে গিয়ে তার জায়গায় ছোট ভাই পিছেলাকে পাঠিয়ে দিল।

গাঁয়ের মাঝখানে যে চক, তার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চারপাশে ইঁট
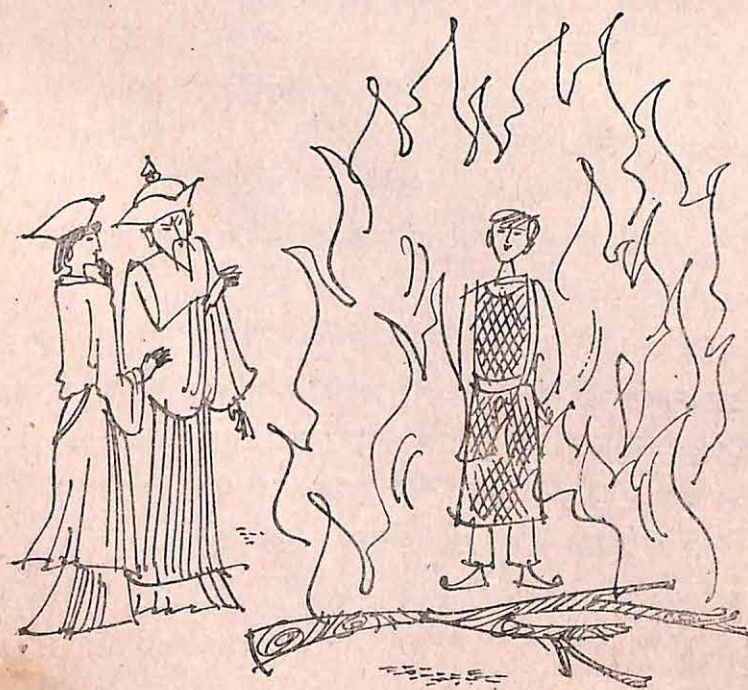
গেঁথে, তার ভেতরে পিছেলাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে মাটি চাপিয়ে নিশ্ছিদ্র ক'রে গর্তটা বুঁজিয়ে দেওয়া হল।

ভালো ক'রে সবাই দেখে নিল। নাঃ, এবার আর বাছাধনের জান বাঁচাবার কোনো উপায় নেই।

তবু বলা তো যায় না। যদি কোনো ফন্দিফিকির ক'রে সে বেঁচে যায়? তাই গাঁয়ের লোক সারা রাত সেখানে ব'সে কড়া পাহারা দিল।

রাত কাবার হয়ে যখন পুবদিকে সুয্যিদেব উঠে আলিস্যি ভাঙছেন, তখন কোদাল দিয়ে মাটি সরানো হল।

মাটি সরাতেই গর্ত থেকে পিছেলা আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসল। তারপর সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে বলল, 'বাপ্‌রে। এ যে দেখছি এক ঘুমে রাত কাবার!'

ওকে বেঁচে থাকতে দেখে গাঁয়ের লোকের আর চোখের পাতা পড়ে না।

এগিয়ে এসে কাজী বলল, 'নাঃ, তোমাকে দেখছি কিছুতেই মারা গেল না। তুমি নিশ্চয় নির্দোষ।'

সবাই একসঙ্গে 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' ব'লে কাজীর কথায় সায় দিল পিছেলা ছাড়া পেয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

তারপর মা-কে নিয়ে পাঁচ ভাই সুখেশান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগল।

এক আবওয়ালা বুড়ো

সে কি আজকের কথা?

এক ছিল বুড়ো। তার ডান গালে ইয়া বড় এক আব। ডাক্তার বদ্যি হেকিম কবিরাজ সে কম দেখায় নি। কিন্তু কেউ কোনো বিহিত করতে পারেনি। ওষুধে কমা তো দূরের কথা, দিন দিন ফুলে আরও ঢোল হয়ে উঠছিল।

এই নিয়ে বুড়োর ছিল অশান্তির একশেষ। ওর বউ অবশ্য ওকে এই ব'লে খুব সান্ত্বনা দিত যে, জীবনে ও তো কারো অনিষ্ট করে নি, ওর মতন সৎলোকও খুব কম আছে। কাজেই একদিন ও কোনো মুশকিল-আশানের দেখা পাবেই পাবে।

রোজ সকাল হয় আর বুড়ো ভাবে আজ হয়ত তেমন কারো দেখা মিলবে। কিন্তু তার আশা শুধু আশাই থেকে যায়।

একদিন হল কি, বুড়ো গেছে পাহাড়ে কাঠকুটো কুড়োতে। সারা-দিন পর পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে টুক টুক ক'রে সে বাড়ি ফিরছে। অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে তবে পাহাড়তলী। এমন সময় আকাশ কালো ক'রে নেমে এল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি।

গাছতলায় যে দাঁড়াবে তারও উপায় নেই। ওপর থেকে টপ টপ ক'রে জল পড়ছে। হঠাৎ বুড়ো দেখতে পেল, একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে বড় রকমের একটা খোঁদল। দেখে চটপট সে তার মধ্যে ঢুকে গেল।

এই আশ্রয়টুকু না পেলে তার কী যে দুর্গতি হত বলার নয়। কেননা বুড়ো যেই খোঁদলে সেঁধিয়েছে, বৃষ্টিও শুরু হল যেন গোটা আকাশ মাথার ওপর ভেঙে পড়ার মত ক'রে। আর সেই সঙ্গে থেকে থেকে বজ্রের হুঙ্কার আর বিদ্যুতের ঝিলিক। ঝড়ের দাপটে গোটা বন যেন ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে।

ঝড়বৃষ্টি যেমন হঠাৎ এসেছিল, খানিকক্ষণ পর তেমনি আবার হঠাৎই থেমে গেল। থেকে গেল শুধু ঝাউগাছের ডাল থেকে টুপটাপ টুপটাপ ক'রে জল পড়ার শব্দ।

বুড়ো দেখল, এইবেলা বাড়ি রওনা না হলে ওর বউ ভেবে অস্থির হবে। গাছের খোঁদল থেকে যেই বাইরে পা দিতে যাবে, অমনি তার কানে এল একসঙ্গে অনেক পায়ের শব্দ। বুড়ো ভাবল, ভালই হল— জঙ্গলের রাস্তায় বেশ কিছু সঙ্গী পাওয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই যা তার চোখে পড়ল, তাতে ভয়ে তার দাঁতে দাঁত লাগার অবস্থা হল। মাটিতে তাল ঠুকতে ঠুকতে যারা তার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, তারা কিন্তু আদৌ মানুষ নয়। ভূত প্রেতের বিরাট এক দঙ্গল।

বুড়ো হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগল, 'নির্জনে একা পেয়ে এবার তো ওরা আমার ঘাড় মটকাবে।'

এমন সময় তার কানে এসে পৌঁছুল গুন্-গুন্ ঠুন্-ঠুন্ হা-হা হি-হি আওয়াজ। বুড়ো চোখ না খুলে পারল না। এরপর যা দেখতে পেল তাতে তার নিজের চোখকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভূতপ্রেতের দল গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে নাচছে আর গাইছে। সেই সঙ্গে চলেছে তাদের খোশ মেজাজে পানভোজন

আর আমোদ-আহ্লাদ।

দেখে ভয় চলে গিয়ে বুড়োর এবার ভারি মজা লাগল। নিজের অজান্তে কখন সে হাততালি দিতে দিতে গা দুলিয়ে পায়ে তাল ঠুকতে শুরু করে দিয়েছে তার নিজেরই খেয়াল নেই।

হঠাৎ তার কানে গেল ওদের পালের যে গোদা সে চেঁচিয়ে বলছে :

'দূঁর! দূঁর! কিঁস্যুঁ হঁচ্ছেঁ না। ইঁহাঁরেঁ কি নাচ কঁয়?' তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'এঁখেঁনে নাচ-জাঁনা কেঁউ নাই?'

বুড়ো দেখল এই হচ্ছে মওকা। এক লাফে সে বাইরে এসে ভূত-প্রেতের দলে নাচ জুড়ে দিল। দেখা গেল, নাচে সত্যি তার কেউ জুড়ি নেই।

পালের গোদা বুড়োর নাচ দেখে মহা খুশি। অন্যরাও খুব তারিফ করল। এমন সুন্দর নাচ তারা নাকি জন্মেও দেখেনি। বুড়োকে তারা ভালো ভালো খাবার, ভালো ভালো সরবৎ দিল।

বুড়োর খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে পালের গোদা তাকে বলল, 'কাঁল আঁবাঁর এঁসেঁ তোঁকেঁ নাচ দেঁখাঁতেঁ হঁবেঁ। আঁসবিঁ তোঁ?'

বুড়ো বলল, 'নিশ্চয় আসব।'

অন্যরা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বুড়ো হাজার হোক মানুষ তো। মানুষেরা বড্ড কথার খেলাপ করে।

ওদের একজন বলল, বুড়োর একটা কিছু নিয়ে রাখা হোক বন্ধক হিসেবে। সবাই এতে সায় দিল।

ভূতপ্রেতের দল বুড়োকে ঘিরে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বুড়োর কোন্ জিনিসটা রেখে দেওয়া যায়।

কেউ বলে, ওর মাথার টুপি।

কেউ বলে, উঁহুঁ, ওর কুর্তা।

হঠাৎ একজনের মাথায় খেলে যায়, ওর ডান গালের আব। ওটা নাকি মানুষদের খুব একটা পয়মন্ত জিনিস। কাজেই অমন একটা সুলক্ষণযুক্ত জিনিস ফিরিয়ে নিতে বুড়োকে কাল আসতেই হবে।

পালের গোদা বলল, 'বঁহুঁৎ আঁচ্ছাঁ।' ব'লে তার ভুতুড়ে আঙুল চালিয়ে বুড়োর ডান গালের আব ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সদলবলে সেই বন থেকে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

বুড়ো কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর হুঁশ হতে সে তার ডান গালে হাত দিয়ে দেখে সত্যিই তার আবটা নেই। তখন আর তাকে পায় কে!

বুড়ো যখন নিজের পাড়ায় এসে পোঁছুল, তখন দেখল তার বউ দুশ্চিন্তায় কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছে।

বউ তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, 'আমি

তো ভেবে ভেবে মারা যাচ্ছিলাম। না জানি তোমার কী হল। জঙ্গলে সাপখোপ, পাহাড়ে পা হড়কানো—'

বলতে বলতে থেমে গিয়ে বুড়োর গালের কাছে মুখ নিয়ে এসে ওর বউ ওর ডান গালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'কী আশ্চয্যি! আব? আব গেল কোথায়?'

বুড়ো তখন হাসতে হাসতে ভূতপ্রেতদের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত বলে।

শুনে বুড়োর বউয়ের আনন্দ আর ধরে না।

পরদিন সকালে দরজায় কড়া নেড়ে যে লোকটা ওদের ঘরে ঢুকল, তার বাঁ গালে ইয়া বড় এক আব। বুড়োদের পাশের বাড়িতে সে থাকে। লোকটা যেমন লুভিষ্টি, তেমনি হিংসুটে। বুড়োর বাড়িতে প্রায়ই আসে চালডাল ধার করতে।

বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে সে অবাক। 'তোমার ডান গালের আব গেল কোথায়? কিভাবে সারালে? তুমি যা করেছ, আমিও তাই করব।'

বুড়ো তখন তাকে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলল। কিভাবে সে গাছের খোঁদলে আশ্রয় নিয়েছিল, সন্ধ্যে হতেই ভূতপ্রেতের দল কি ভাবে নাচগানহল্লার আসর জমিয়েছিল, ওর নাচ দেখে খুশি হয়ে কিভাবে ওরা তার ডান গালের আব গচ্ছিত রেখেছিল — সমস্তই বুড়ো তাকে একে একে বলল।

শুনে পাশের বাড়ির লোকটা বলল, 'তবে আজ রাতে আমিও সেখানে যাচ্ছি। তুমি যা করেছ, আমিও তাই করব।' ব'লে এক বস্তা চাল ধার ক'রে নিয়ে সে নিজের বাড়িতে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বুড়োর সেই লুভিষ্টি প্রতিবেশী পাহাড়ের সেই জঙ্গলে গিয়ে হাজির হল। সেদিনের সেই গাছটাও সে ঠিক খুঁজে বার করল। তারপর গাছের খোঁদলের মধ্যে ঢুকে ভূতপ্রেতের দলটার জন্যে হা-পিত্যেশে অপেক্ষা ক'রে রইল।

সূর্য পাটে বসতে মেঘেরা হল সোনার বরণ। আর তারপরই যেই ঝপ্ ক'রে নেমে এল সন্ধ্যে, অমনি ভূতপ্রেতের দল গাছটার সামনের ফাঁকা জায়গাটায় হুড়মুড় ক'রে নেমে এসে শুরু ক'রে দিল ধেই ধেই নৃত্য।

পালের গোদা এদিক ওদিক চেয়ে বলে, 'কঁই গোঁ, সেঁই নাচুঁনে বুঁড়োটা কঁই ?'

'এই তো আমি, এই তো আমি', ব'লে সেই লুভিষ্টি লোকটা গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে ছাতা হাতে নাচতে শুরু ক'রে দিল।

কিন্তু নাচ সে জানলে তো! মাটিতে পা ঠুকে ঘাড় ঝাঁকালেই কি নাচ হয় ?

ওর ঐ তিড়িং বিড়িং লম্ফঝম্প দেখে ভূতপ্রেতেরা মোটেই খুশি হল না। অথচ আগের দিন বুড়ো কী সুন্দর নাচ দেখিয়েছিল।

পালের গোদা রেগেমেগে তাকে বলল, 'এঁই নাওঁ তোঁমার আঁব।' ব'লে লোকটার ডান গালে বন্ধকী আবটা ধাঁই ক'রে লাগিয়ে দিয়ে ভূতপ্রেতের দল নিয়ে সেই মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে গেল।

লুভিষ্টি বেচারা থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল।

এতদিন তার ছিল শুধু বাঁ গালে আব। এবার তাকে দু গালে আব নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটাতে হবে।

তবে লোভ করার জন্যে তার হয়েছিল রীতিমত উচিত শিক্ষা।

সেই থেকে সে প্রতিজ্ঞা করল আর কখনও সে নাম ভাঁড়িয়ে পরের নকল করবে না।

এক যে ছিল কড়ি গাছ

এক গাঁয়ে ছিল এক বুড়ো বাঘ। গায়ে ফোঁটাতিলক-কাটা সেই বুড়ো বাঘের ছিল এক ভারি সুন্দর কড়িগাছ।

গাছের ডালে ডালে ঝুলে থাকত সাদা ধবধবে কড়ি — কত যে তার গোনাগুনতি নেই। কড়ির গা থেকে ঠিক্‌রে পড়ত আলো, সেই আলোয় আলো হত দশ দিক, দশ দিগন্ত।

বুড়ো বাঘের সব সময় ভয়, পাছে তার একটা কড়িও চুরি যায়। তাই চৌপহর দিন, চৌপহর রাত সে জেগে জেগে পাহারা দেয়, ভাঁটার মতো চোখ দুটো তার চরকির মতো ঘোরে। কড়িগাছ তো নয়, বুড়ো বাঘ যেন আগলায় তার যখের ধন।

গাঁয়ের কচিকাঁচার দল দূর থেকে কড়িগাছের দিকে তাকায়। সাদা ধবধবে কড়িগুলো যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু গাছতলায় যায় কার সাধ্যি? হিংসুটে বাঘ অমনি হালুম ক'রে তেড়ে আসবে।

তাই তারা ভাবে — আহা, একটা দিনও বাঘ যদি কোথাও বেড়াতে যায় তো দিনটা মনের সুখে কড়ি খেলে কাটাই।

ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে সেই দলের সর্দার। নাম তার শুক্লা। ক্ষুরের মতো তার বুদ্ধি।

কড়িগাছের কাছেই শুক্লাদের বাড়ি। তাদের দাওয়া থেকে গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। রোজ ভোরে উঠেই শুক্লা প্রথম তাকায় সেই কড়িগাছের দিকে। কিন্তু গাছের কোল জুড়ে বসে থাকা বুড়ো বাঘের দিকে চোখ পড়তেই মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। তবু সে আশায় থাকে; একদিন বাঘের কবল থেকে তারা কোঁচড় ভরে ছিনিয়ে আনবে যত ইচ্ছে কড়ি। শুক্লা তার বন্ধুদেরও ভরসা দেয়।

এমনি করে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন বুড়ো বাঘের খিদে পেল। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল প্রচণ্ড খিদেয়। কিন্তু সে যদি শিকারে যায়, কড়িগাছ কে পাহারা দেবে? খিদেয় মাথা ঝিমঝিম করে বাঘের। আর যেন সে কিছুই ভাবতে পারে না। বাঘ পেটের জ্বালায় জঙ্গলের দিকে থাবা বাগিয়ে ছুটে যায়।

এদিকে শুক্লা ঘুম ভেঙে উঠে কড়িগাছের দিকে চায়। গাছতলাটা ফাঁকা; বাঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুক্লা বার বার চোখ দুটো রগড়ে নেয় আর তাকায়। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। তারপর যখন বোঝে, সত্যি সত্যিই গাছতলায় বাঘ নেই — তখন সে লাফাতে লাফাতে বন্ধুদের বাড়িতে ছোটে। সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড়ো করে শুক্লা কড়িগাছের দিকে এগিয়ে যায়। সকলেরই দারুণ ফুর্তি। কচি গলার হৈ-হল্লায় ভরে ওঠে গাঁয়ের বাতাস।

গাছতলায় গিয়ে তারা যে যত পারে কড়ি কুড়োয়। কোঁচড়ে তাদের কড়ি আঁটতে চায় না। শুক্লার কিন্তু মাটিতে ঝরে-পড়া আধভাঙা কড়িতে মন ওঠে না। সে তাই কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠেছে মগডালে। সেখানে থোলো থোলো বড় বড় কড়ি ঝুলছে সারে সারে। শুক্লা দুহাত বাড়িয়ে কড়ি পাড়ে আর আঁচলে বোঝাই করে। নীচে-দাঁড়িয়ে-থাকা তার বন্ধুদের জন্যেও শুক্লা টপাটপ কড়ি ফেলে।

এমন সময় — 'হালুম' !

'ওরে, ওরে বাঘ এসেছে—' ছেলেমেয়ের দল কোঁচড়ের কড়ি ফেলে যে যেদিকে পারে ছুট দেয়।

অনেক উঁচু মগডালে বসে ছিল শুক্লা। গোড়ায় সে বাঘের ডাক, বন্ধুদের চিৎকার কিছুই শুনতে পায় নি। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ গাছতলায় শুনতে পেল: 'হা-লু-ম!' নীচে তাকিয়ে দেখে বাঘের ভয়ে বন্ধুরা পালিয়ে গেছে। ভয়ে হিম হয়ে আসে শুক্লার হাত-পা। কিন্তু কী আর করবে। মগডালে বসে মনের দুঃখে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

একফোঁটা জল বাঘের পিঠে পড়তেই বাঘ অমনি জিভ দিয়ে চেটে নেয়। 'আরে এ যে নোন্‌তা নোন্‌তা লাগে। নিশ্চয় মানুষের চোখের জল।'
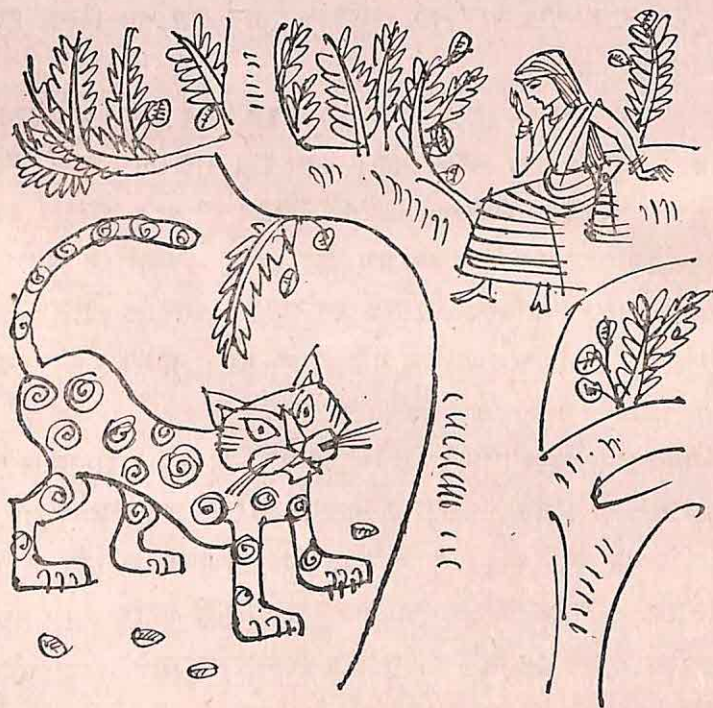
বাঘ তখন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'গাছের ওপর কে রে ? ভালো চাস তো শীগগির নেমে আয়। নইলে রক্ষে রাখব না।'

শুক্লা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল গাছ থেকে। কেঁদে কেঁদে মুখখানা তার রাঙা হয়ে উঠেছে — দেখে ভারি মায়া হল বুড়ো বাঘের।

বাঘ বলল, 'দ্যাখ, তুই যদি আমায় বিয়ে করিস, তাহলে তোকে খাব না। বরঞ্চ কড়িগাছটা তোকে যৌতুক দেব। আর যদি বিয়ে করতে রাজী না হস, তাহলে এক্ষুনি তোর ঘাড় মটকাব।'

শুক্লা আর কী করে ! রাজী হল।

বুড়ো বাঘ খুশিতে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসে। তারপর শুক্লাকে পিঠে চড়িয়ে ড্যাং ড্যাং করে বাড়ি ফেরে। বাঘের ছোট ছোট বাচ্চা দুটোকে দেখাশুনো করার ভার পড়ে শুক্লার ওপর। শুক্লাকে বাড়িতে রেখে বাঘ যায় বাজার করতে।

'হা-লু-ম' — বলে বাঘ লাফিয়ে পড়ে ময়রার দোকানে। দোকানদার পড়ি-মরি করে ছোটে প্রাণ নিয়ে। বাঘ যত পারে বউয়ের জন্যে খাবার-দাবার নিয়ে বাড়ি ফেরে। এমনি করে আজ কাপড়ের দোকান, কাল গয়নার দোকান লুট করে করে বাঘ বাড়ি বোঝাই করে। শুক্লা বাঘিনী হয়ে বাঘের বাচ্চাদের খাওয়ায়, নিজে রান্নাবান্না করে রাজভোগ খায়। বাঘের খুব সুখের সংসার।

একদিন বাঘের হল পিঠে খাওয়ার শখ।

বাঘ বলল, 'গিন্নী, আজ আমার জন্যে পিঠে তৈরি করো তো। আমার ফিরতে রাত হবে আজ। মাসীর অসুখ, তাই দেখতে যাচ্ছি। এসে যেন গরম গরম পিঠে পাই।'

শুক্লা বলল, 'আচ্ছা।'

বাঘ তখন মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেল জঙ্গলে ! বাঘও যেই বেরোল, অমনি শুক্লাও খিড়কির দরজা খুলে এক দৌড়ে গিয়ে বাবার কাছে হাজির। শুক্লাকে দেখে তার বাপ-মার আনন্দ আর ধরে না।

শুক্লা তার বাবাকে সব খুলে বলল। তারপর দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে কী সব ফন্দি আঁটল।

এদিকে রাত্তিরে তো বাঘ মাসীর বাড়ি থেকে ফেরে। দরজায় ঘা দিয়ে ডাকে, 'গিন্নী ও গিন্নী, দরজা খোলো।'

ভেতর থেকে গিন্নীর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। শুধু কানে একটা আওয়াজ আসে — ছ্যাঁক ছ্যাঁক। বাঘ বুঝল গিন্নী তার পিঠে ভাজছে।

তখন সে আরেকটু গলা চড়িয়ে ডাকে, 'বড্ড খিদে পেয়েছে, গিন্নী — দরজাটা একটু তাড়াতাড়ি খোলো না, লক্ষ্মীটি খোলো।' তবু গিন্নীর কোনো সাড়া নেই। শুধু একঘেয়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক — পিঠে ভাজার শব্দ।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরও সাড়া না পেয়ে বাঘের ভারি রাগ হল : আচ্ছা বেআক্কিলে লোক তো! বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো করে ডাকছি, তবু গিন্নীর সাড়া নেই!

বাঘ তখন দমাদম ঘা মেরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই তার চক্ষু চড়কগাছ। গনগনে উনুনের ওপর মস্ত বড় কড়াই চড়ানো। তাতে টগবগ করে তেল ফুটছে। আর কড়ার এক হাত ওপরে ঝুলছে টুঁটি-কাটা বাঘের বাচ্চা দুটো। তাদের টুঁটি থেকে টপটপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে। আর আওয়াজ হচ্ছে — ছ্যাঁক ছ্যাঁক। এদিকে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গিন্নীকে পাওয়া গেল না।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাঘ ছুটল শুক্লাদের বাড়ি। তাকে পেলে আর আস্ত রাখবে না।

শুক্লা আর শুক্লার বাবা আগে থেকে বাড়ির সব দরজা এঁটে রেখেছিল। তারা জানত বাঘ শুক্লার খোঁজে একবার আসবেই আসবে।

অনেক রাত্তিরে বাঘ এসে শুক্লাদের বাড়ির দরজায় ঘা দেয়। রাগে গজরাতে গজরাতে হাঁক দেয়, 'আমার বৌকে নিতে এসেছি,

ভালো চাও তো শিগগির দরজা খোলো। নইলে দরজা ভেঙে তোমাদের সব কটার ঘাড় মটকাব।'

শুক্লার বাবা ভেতর থেকে সাড়া দেন। চেঁচিয়ে বাঘকে ডেকে বলেন, 'আহা বাবাজী, অত চটো কেন? তোমার বউ তুমি নিয়ে যাবে — সে তো ভালো কথা। কিন্তু তোমার গলার আওয়াজে ভয়ে আমাদের হাত-পা যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তাই দরজা খুলতে যেতে পারছি না। তার চেয়ে এক কাজ করো, রান্নাঘরের নর্দমার কাছে এসে দাঁড়াও। তোমার বৌকে নর্দমা গলিয়ে ফেলে দিচ্ছি, লুফে নাও।'

বাঘ বলল — 'বেশ, নর্দমা গলিয়ে ছুঁড়ে দাও।'

এই বলে নর্দমার মুখে হাঁ করে বসে থাকল — শুক্লাকে পেলেই যাতে সে টপ করে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে।

দেরি দেখে বাঘ যেই ডাক ছাড়ল, 'হালুম' — অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুক্লার বাবা এক জালা ফুটন্ত ফ্যান সড়াত করে ঢেলে দিলেন নর্দমার মুখে।

ফুটন্ত ফ্যান অর্ধেক পেটে গিয়ে অর্ধেক গায়ে মেখে বুড়ো বাঘের ভীষণ জ্বলুনি পুড়ুনি শুরু হল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে। কিছুক্ষণ পর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে দাঁতমুখ ছিরকুটে বুড়ো বাঘ সেখানেই পড়ে মরে গেল।

তারপর আর শুক্লাকে পায় কে! সে তার বন্ধুদের নিয়ে গেল কড়িগাছতলায়। কড়িগাছ হল তাদের। এখন যত ইচ্ছে কড়ি নিয়ে খেলো — কেউ কিছু বলবার নেই।

পায়ে যার জুতো নেই

অনেক দিন আগের কথা। এক সাদা চামড়ার মনিবের ছিল কালো নিগ্রো এক গোলাম। নাম তার জন।

রোজ রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মাটিতে হাঁটু গেড়ে সে হাত জোড় করে ভগবানকে ডেকে বলত, 'হে দয়াল প্রভু, এক্ষুনি তুমি তোমার অগ্নিরথ পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাও। আমি যে আর পারি না। আমার কষ্টের কথা তুমি তো সবই জান। আমার মনিব আমায় উদয়াস্ত খাটিয়ে মারে। একটু হাঁফ ফেলারও সময় দেয় না। হে দয়াময় ভগবান, তুমি এসো এক হাতে শান্তি আর এক হাতে বরাভয় নিয়ে। আমাকে উদ্ধার করো এই দুঃখতাপের সংসার থেকে। তোমার স্বর্গপুরীতে আমাকে নিয়ে চলো। খেটে খেটে আমি ক্লান্ত; আমাকে ত্রাণ করো!'

একদিন রাত্তিরে জনের মনিব যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। জনের ভাঙা কুঁড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার কানে এল ভগবানকে ডেকে জন বলছে, 'হে দয়াল প্রভু, এক্ষুনি তুমি তোমার অগ্নিরথ পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাও।' জনকে জব্দ করার জন্যে তার মনিব

একটা ফন্দি আঁটল।

জনের ভাঙা কুঁড়ের কাছেই তার মনিবের প্রকাণ্ড চকমিলানো কুঠি। তাড়াতাড়ি নিজের কুঠিতে ফিরে গিয়ে একটা সাদা বিছানার চাদর নিয়ে আসে জনের মনিব। তারপর সেই সাদা চাদরে গা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে সে জনের দরজায় এসে কড়া নাড়ে।

জন হাঁটু গেড়ে বসে তখনও ভগবানকে ডাকছিল। কড়া নাড়া শুনে ভেতর থেকে সে সাড়া দিল, 'কে ডাকে ?'

সাদা চামড়ার মনিব তার গলার স্বর বদলে বলল, 'আমি ভগবান,—দুঃখের জগৎ থেকে অগ্নিরথে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, জন।'

শুনে তো জন তাড়াতাড়ি খাটিয়ার তলায় গিয়ে ঢোকে। বউকে ডেকে ফিসফিস করে বলে, 'লিজা, বলে দাও আমি বাড়ি নেই!'
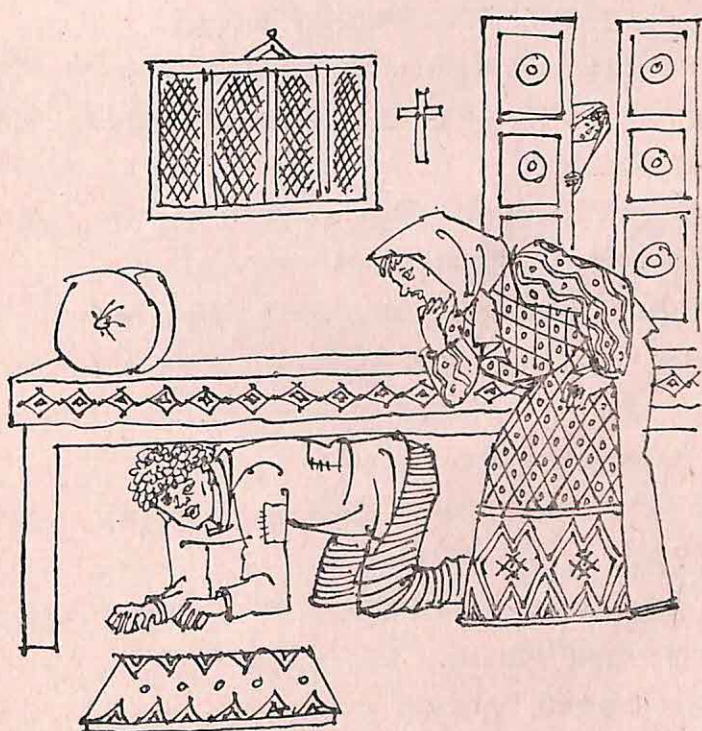
লিজা প্রথমটা চুপ করে থাকে। কিন্তু ভগবান ছাড়ার পাত্র নন। কেবলই জনকে ডেকে বলেন, 'চলে এসো জন, চলে এসো — আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে চলো। সেখানে ক্ষেতও চষতে হবে না, ধানও বুনতে হবে না। খাবে দাবে আরামে থাকবে, চলে এসো জন, চলে এসো।'

লিজা তখন উত্তর দেয়, 'উনি এখন বাড়ি নেই, প্রভু। পরে আসবেন।'

ভগবান কিন্তু নাছোড়বান্দা ; বলেন, 'তবে লিজা, তুমিই এসো।'

লিজা কী আর করবে — তার স্বামীকে তখন ডেকে বলে, 'যাও না গো, খাটের তলায় বসে না থেকে মরদের মতো বাইরে যাও। এতদিন ডেকে এসেছ — প্রভু নিতে এসেছেন, এখন যাব না বললেই হল ?'

জন কোনো কথা না বলে দেয়ালের দিকে আরও একটু সরে যায়। এদিকে ভগবান সমানে দরজার কড়া নাড়েন।

লিজা বলে, 'যাও না গো — অত করে সাধছেন, যাও না। তুমি না স্বর্গে যাবার জন্যে হুতুশে হয়ে উঠেছিলে — এখন যাও না, স্বর্গে যাও প্রভুর সঙ্গে।'

জন বলে, 'শুনলে তো তুমি — ভগবান বললেন "লিজা, তুমিই এসো।" অতই যদি, যাও না তুমি ওঁর সঙ্গে।'

লিজা চটে গিয়ে বলে, 'কোনো চুলোয় নড়ছি না আমি — এই জেনে রেখে দাও ! তুমি যেমন এতদিন স্বর্গে যাবার জন্যে হেদিয়ে এসেছ — এখন ভালোয় ভালোয় খাটিয়ার তলা থেকে বেরিয়ে না এলে ঠিক আমি ভগবানকে বলে দেব।'

ভগবানরূপী জনের মনিব আবার ডাকে, 'তবে লিজা, তুমিই এসো।'

লিজা এবার ভগবানকে শুনিয়ে বলে, 'প্রভু, জন ঘরেই আছে। খাটিয়ার তলায় লুকিয়ে।'

ভগবান ডাকেন, 'চলে এসো জন, চলে এসো। আমার সঙ্গে স্বর্গে

যাবে চলো। তোমার জন্যে অক্ষয় স্বর্গবাসের সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি আমি।'

জন তখন খাটিয়ার তলা থেকে বেরিয়ে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরেটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। সাদা মূর্তির ওপর চোখ পড়তেই ভয়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসে জন।

তারপর চেঁচিয়ে বলে, 'হে প্রভু, এই নোংরা পোশাকে কী করে তোমার রথে চড়ে যাই বলো — তার চেয়ে একটু দাঁড়াও, ধোপ-দেওয়া প্যান্টটা পরে নিই।'

ভগবান বলেন, 'আচ্ছা জন, তবে তুমি ধোপ-দেওয়া প্যান্টটাই পরে নাও। আমি ততক্ষণ দাঁড়াচ্ছি।'

প্যান্ট বদলাতে বদলাতে জন যতক্ষণ পারে ইচ্ছে করে করে দেরি করে। তারপর দরজার কাছে এসেই আবার সেই বিকট সাদা মূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়।

জন বলে, 'হে প্রভু, শাস্ত্রে বলে স্বর্গে কোনো ময়লা নেই। আমার গায়ের শার্টটা ঘামে জবজব করছে। তোমার সঙ্গে এই ময়লা উলিডুলি শার্টটা পরে যাই কী করে ? তার চেয়ে একটু দাঁড়াও, একটা আস্ত ধোপদুরস্ত শার্ট গলিয়ে নিই।'

ভগবান বলেন, 'আচ্ছা জন, তুমি বরং শার্টটা বদলেই নাও।'

জন আবার যতটা পারে দেরি করে। তারপর ফরসা শার্টটা গায়ে চড়িয়ে দরজার কাছে যায়। জনের মনিব তখনও দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে। জনের থাকার মধ্যে শুধু ঐ শার্ট আর প্যান্ট, আর কিছুই নেই যা বদলাবার ছল ক'রে সময় কাটাবে।

অগত্যা দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে খুলে দিয়ে জন বলে, 'হে প্রভু, আমি তোমার সঙ্গে অগ্নিরথে স্বর্গে পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি। কিন্তু তোমার দেহ থেকে যে জ্যোতি বেরুচ্ছে, আমি তার সামনে যেতে পারছি না। তুমি একটু সরে দাঁড়ালে ভালো হয়।'

শুনে জনের মনিব দাওয়ার পাশে একটু সরে দাঁড়ায়।

বাইরেটা এক নজরে দেখে নিয়ে জন আবার বলে, ‘প্রভু, তুমি তো জানো আমি তোমার জুতোর ধুলোরও যুগ্যি নই। তোমার জ্যোতি এখনও এত প্রখর যে, আমি সামনে যেতে পারছি না। দয়া করে প্রভু, আরেকটু সরে দাঁড়াও। দোহাই তোমার।’

জনের মনিব আরও এক কদম সরে দাঁড়ায়।

আর একবার বাইরেটা ভালো করে দেখে নিয়ে জন কাতর কণ্ঠে বলে, ‘হে ভগবান, কোথায় স্বর্গ আর কোথায় মর্ত্য। আমরা হচ্ছি সেই মর্ত্যের পাপীতাপী মানুষ। তোমার তেজ আমরা সইব — আমাদের সে সাধ্যি কোথায়? হে দয়াময় প্রভু, তোমার অগ্নিরথে গিয়ে আমি উঠব — কিন্তু আরেকটু সরে না দাঁড়ালে যে পারছি না।’

তাই শুনে জনের মনিব আরও দু-এক কদম সরে দাঁড়ায়। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে জনকে ঝড়ের বেগে সামনে ছুটে যেতে দেখা গেল। আর পেছনে পেছনে তাড়া করল তার মনিব। মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ুতে লাগল তারা। ঘাস জমি পেরিয়ে, তুলোর বাগান পেরিয়ে ধানক্ষেতে পৌঁছে মনিবের সাধ্যি হল না জনকে ধরার। জন যেন ছোটে হাওয়ার আগে আগে।

শোরগোল শুনে ঘরের মধ্যে জনের ছেলেপুলেদের ঘুম যায় ভেঙে। তারা কেঁদে ওঠে। বড় মেয়েটি লিজাকে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওমা, —ভগবান কি বাবাকে ধরে পাক্‌ড়ে স্বর্গে নিয়ে যাবে?’

লিজা তাকে ধমক দিয়ে বলে, ‘চুপ কর্‌, বোকা কোথাকার। ভগবান তোর বাপের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? তোর বাপের পায়ে তো আর জুতো নেই।’

পাঁচ ভাই পাঁচ রত্ন

হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। সেই যুগের কথা।

চারিদিকে পাহাড়, মধ্যিখানে ছোট্ট একটা কাঠের ঘর। সেই ঘরে থাকত এক বুড়ো আর এক বুড়ি। লোকে দেখলে হয়তো বলত, আহা কী গরিব ওরা। বুড়ো-বুড়ি কিন্তু মোটেই তা মনে করত না। তারা বলত, পাঁচ-পাঁচটা ছেলে যার, তার বেশি ধন কার? ছেলে তো নয়, যেন দেবশিশু — যেমন টুকটুকে রঙ, তেমনি নাদুস নুদুস। ছেলেরা যেন বুড়ো-বুড়ির চোখের মণি। ভাইদের মধ্যে ভারি ভাব, একদণ্ড তারা কাছছাড়া হয়ে থাকে না। ভাইয়ে ভাইয়ে বয়েসের তফাত তাদের মাত্র বছর খানেকের।

একদিন বুড়ো-বুড়ি গেছে ঘাস কাটতে। ছেলেরা একা আছে বাড়িতে। শীতের সকাল হলে কি হয়, চনচনে রোদ উঠেছে বাইরে। পাঁচ ভাই না বেরিয়ে পারে না। বাড়ির সামনে ছোট বাগানে তারা খেলা জুড়ে দেয়। তাদের হৈ-চৈ হাসিতে গম্‌গম্ করতে থাকে চারিদিকের পাহাড়।

এমন সময় এক হাড়-জিরজিরে বুড়ি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছিল সেই

পথ দিয়ে। গলা দিয়ে তার ভালো করে স্বরও বেরুচ্ছিল না। ছেলে পাঁচটিকে দেখে বুড়ি কোনোরকমে বলল :

'বাছারা, দয়া করে বুড়িকে একফোঁটা জল দেবে ?'

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ভাই খেলা বন্ধ করে ছুটে এল। বড়টি ছুটে ইঁদারায় গেল জল আনতে। বাকি ভাইরা ধরাধরি করে খোঁড়া-পা বুড়িকে দাওয়ার ওপর বসিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে বলল। দেখতে দেখতে বড় ভাই এক কুঁজো ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে হাজির। বলল, 'খুব ভাল ইঁদারার জল এনেছি, ঠানদি — খেয়ে নাও।'

জলটল খেয়ে খোঁড়া-পা বুড়ি প্রাণ ভরে তাদের আশীর্বাদ করে। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করে, 'বাছা, তোমাদের নাম কী ?'

পাঁচটি ভাই হেসে বলে, 'আমাদের কারোই কোনো নাম নেই! আমরা সবাই প্রায় সমবয়সী ; তাই একসঙ্গেই আমরা কাজকর্ম করে থাকি। কোনো কিছু করার দরকার হলে আমাদের বাপ-মা শুধু "বাছারা" বলে হাঁক দেন। আমরা কাছেই থাকি। ডাক শুনলেই একসঙ্গে সবাই ছুটে যাই।'

খোঁড়া-পা বুড়ি বলে, 'তোমাদের শরীরে দয়া আছে ; তোমরা ছুটে না এলে আরেকটু হলে তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরতে বসেছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছে মনের মতো কিছু দিই তোমাদের। কিন্তু পোড়া কপাল আমার, দেবার মতো কিছু নেই আমার। তবে আমি একটা জিনিস করতে পারি তোমাদের জন্যে। তোমাদের একটা করে নাম দিয়ে যাই।' বড়টির দিকে তাকিয়ে খোঁড়া-পা বুড়ি বলে, 'তোমার নাম থাকল "বীর-বাহাদুর", আর তোমার ভাইদের নাম থাকল, "ধর্-বাহাদুর", "কাট্-বাহাদুর", "দেখ্-বাহাদুর", আর "উঠ্-বাহাদুর"। বড় হয়ে এই নামেই তোমাদের কপাল ফিরবে।'

চলে যাবার সময় খোঁড়া-পা বুড়ি পাঁচ ভাইকে আর-একবার তাদের নামগুলো মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যের পর বুড়ো-বুড়ি ঘরে ফিরলে পাঁচ ভাই ছুটে এসে খোঁড়া-

পা বুড়ির কথা বলল। খোঁড়া-পা বুড়ি তাদের যেসব অদ্ভুত নাম দিয়ে গেছে, তাও তারা বাপ-মাকে বলল। খোঁড়া-পা বুড়ি কোথায় থাকে, কী করে — কিছুই তারা বলতে পারল না।

এদিকে একটা মজার জিনিস দেখা যেতে লাগল। পাঁচ ভাই যত বড় হয়, ততই যার যা নাম তার মধ্যে সেই গুণ বেশি করে ফুটে উঠতে লাগল। বীর-বাহাদুর ছোট ভাইদের দেখাশুনো করে। ভাই-দের সে-ই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ধর্-বাহাদুর ভারী ভারী বোঝা বয়। শীতে জ্বালানি কাঠের যখন খুব দরকার পড়ে, কাট্-বাহাদুর জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনে। দেখ্-বাহাদুরের নজর ভারি কড়া; খরগোশই হোক, পাখিপাখালিই হোক — কিছুই তার চোখ এড়াতে পারে না। উঠ্-বাহাদুর দিব্যি খাড়া পাহাড় বেয়ে তরতর করে উঠে যায়।

পাঁচ ভাই দিনে দিনে ডাগর হয়ে ওঠে। গোঁফের রেখা দেখা দেয়। দেখতেও বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান হয়ে ওঠে তারা। এতখানি বয়েস হল, তবু তারা ঐ পাহাড় ছেড়ে কোথাও যায় নি। তারা ঠিক করল, এবার দেশভ্রমণে বেরোবে। বুড়ো বাপ-মা তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, 'এতদিন যেমন ভাইয়ে ভাইয়ে একঠাঁই ছিলে, তেমনি একঠাঁই হয়ে থাকবে। দেখবে তাহলে সব মনস্কামনাই তোমাদের পূর্ণ হবে।'

উঁচু পাহাড়ের খাড়া পথ ধরে যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ে পাঁচ ভাই। পাহাড় পেরিয়ে মেঠো রাস্তা ধরে তারা এগোয়। কখনও কোনো গোলাবাড়িতে, কখনও কোনো গাঁয়ে গিয়ে তারা ওঠে; কিন্তু কোথাও তারা পাকাপাকিভাবে কাজ পায় না। কোনো কোনো চাষী বীর-বাহাদুর আর দেখ্-বাহাদুরকে রাখালির কাজ দিতে চাইল; কিন্তু ধর্-বাহাদুর আর উঠ্-বাহাদুরের কোনো কাজ মিলল না। আবার যখন মাছ মারা কিংবা পাখি শিকারের দরকার, তখন আবার শেষ দুটি ভাই ছাড়া বাকি তিন ভাইকেই বেকার বসে থাকতে হয়।

তবু তারা দমে না। উঁচু উঁচু পাহাড় আর বড় বড় নদী ডিঙিয়ে তারা এগোয়। যে-তে যে-তে যে-তে—তারা এক পাইনের বনে এসে পোঁছোয়; বড় বড় কাঁটাগাছে অগম্য সেই বন। কাট্-বাহাদুর আগে আগে গিয়ে রাস্তা সাফ করে।

বনজঙ্গল পেরোতেই এক বিরাট তেপান্তর। সেখানে এসে পাঁচ ভাই অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে চায়। সামনে কী দেখা যায় ওটা? পাণ্ডববর্জিত দেশে কোন্ রাজার শহর? উঁচু উঁচু মিনারে আর প্রাকারে প্রাকারে ঝলমল করছে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর। বেগুনী, সোনালী, গোলাপী—বিচিত্র রঙ। শহরের চারদিকে বেড়-দেওয়া নদীটা যেন দেখাচ্ছে কাঁচা সোনার মতো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচটি ভাই।

তারপর বীর-বাহাদুর বলে, 'এ নিশ্চয় কোনো রাজার শহর।'

দেখ্-বাহাদুর বলে, 'তাই বলেই তো মনে হচ্ছে। রাজবাড়ির মাথায় ওটা রাজপতাকা নয়?'

সবাই মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

তেপান্তর পেরোতে পেরোতে সন্ধ্যে হয়। নদীর ওপর মস্ত এক সাঁকো। ওপারে পোঁছুতেই ছুটে এল রাজার সেপাই। পাঁচ ভাইকে সে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল সোজা রাজদরবারে। পাঁচ ভাই রাজাকে কুর্নিশ করে জানাল, তারা কাজ চায়। ছেলে পাঁচটিকে দেখেই ভারি পছন্দ হয়ে গেল রাজার। যেমনি লম্বা-চওড়া, তেমনি প্রিয়দর্শন; টানা টানা ভুরুর নিচে উজ্জ্বল নীল চোখ, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। রাজা বললেন, যদি তারা রাজী থাকে তবে পাঁচ ভাইকেই তিনি কাজ দিতে পারেন; তাদের গোটা শীতকালটা রাজবাড়িতে থেকে বড়দিনের কটা দিন রাজকন্যাদের পাহারা দিতে হবে।

রাজা বললেন, 'আগেই বলে দিচ্ছি, কাজটা হাতে নেবার আগে ভালো করে কিন্তু ভেবে-চিন্তে দেখো। আমি ঠিক করেছি, এবার যারা দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হবে, তাদের প্রাণদণ্ড দেব। তবে

একাজে অন্য লোকের চেয়ে তোমাদের একটা সুবিধেও আছে — তোমরা পাঁচজনেই হচ্ছ সহোদর ভাই, তোমরা একসঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত। কাজেই পাঁচ রকমের পাঁচজন লোকের চেয়ে তোমরা হবে অনেক বেশি সজাগ।'

এবারে রাজা কাজের কথাটা পাড়েন, 'শোনো তবে বলি। আমার ছিল পাঁচটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। গেল বছরের আগের বড়-দিনের রাত্তিরে আমার বড় মেয়ে এল্‌মা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আজও তার কোনো খোঁজ মিলল না। গেল বছরের বড়দিনে তাই সারারাত কড়া পাহারা বসানো হল রাজকন্যাদের কুঠুরিতে; অনেক দিনের বিশ্বস্ত দাসদাসী ছাড়া কাউকে সে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল না। পরদিন সকালে দেখা গেল, মেজ মেয়ে আইরিনের বিছানা খালি। তার মাথার শিয়রের জানলায় কারো পায়ের ছাপও পাওয়া গেল না। আমি তাই এবার পণ করেছি, বড়দিনের রাত্তিরে যদি আমার আর কোনো মেয়ে চুরি যায় — তাহলে যে-যে পাহারায় থাকবে, তার-তার মাথা কাটা পড়বে। আমার এ-কথার কোনো নড়চড় হবে না। তবে এও বলে রাখছি যে, অদৃশ্য শয়তানের হাত থেকে যে আমার মেয়েদের বাঁচাতে পারবে, তাকে আমি জামাই করব। তাকে আমি সন্তানের মতো ভালোবাসব। এ কাজ হাতে নেবার আগে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভালো করে ভেবে দেখো। কাজটা শক্ত। যদি তোমরা রাজী থাকো, তাহলে হয় মৃত্যু, নয় বিজয়গৌরব — এ দুয়ের একটা বেছে নাও।'

সমস্ত শোনার পর পাঁচ ভাই একবাক্যে জবাব দিল, 'আমরা রাজী আছি। রাজকন্যাদের আমরাই পাহারা দেব।' বড় ভাই বীর-বাহাদুর এগিয়ে এসে বলল, 'পাঁচ ভাইয়ের হয়ে আমিই থাকলাম জামিন। যদি আমরা রাজকন্যাদের বাঁচাতে না পারি, আমাকে শূলে চড়াবেন।'

তারপর রাজবাড়িতে থেকে যায় তারা। রাজার ভারি মায়া পড়ে যায় তাদের ওপর। পাঁচটি ভাই যেন হীরের টুকরো। তাদের মাথার ওপর তিনি যে খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখেছেন, তার জন্যে দুঃখ হয় তাঁর।

যাতে কোনো বিঘ্ন না হয়, তার জন্যে রাজার হুকুমে তৈরি হয় আকাশ-ছোঁয়া মিনার, বড়দিনের রাত্রে রাজকন্যারা থাকবে সবচেয়ে ওপরের ঘরে।

এদিকে বড়দিনের উৎসব ঘনিয়ে আসে। কটা দিন হৈ-চৈ ফুর্তিতে নেশার মতো কাটে। শেষদিন নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদ শেষ হবার পর রাজা তাঁর তিন মেয়ে ফ্রিডা, ইডা আর মেয়াকে মিনারের চিলে-কোঠায় পোঁছে দিয়ে আসেন। সেখানে সোনার পালঙ্কে তাদের শুইয়ে দিয়ে রাজকন্যাদের পাহারায় বসিয়ে রেখে আসেন হীরের টুকরো পাঁচটি ভাইকে। তারপর নিচে নেমে ভারী দরজায় বড় বড় ছটো কুলুপ এঁটে দেন। রাজবাড়ি থমথম করছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। চারদিকে কী-হয় কী-হয় ভাব।

রাজকন্যাদের পাশের ঘরে পাঁচ ভাই পাহারায় থাকে। ছটো ঘরের মাঝখানে একটা বাতি জ্বালানো থাকে। সারাদিন হৈ-চৈতে ভাইরা সব ক্লান্ত। তাই ছোট ভাইদের ঘুমোতে ব'লে একা রাত জাগে বীর-বাহাছুর। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শীতের এক কোট প'রে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে। কিছুতেই ছচোখের পাতা এক করে না।

ক্রমে রাত নিশুতি হয়। বীর-বাহাছুর তবু চক্ষের পলক ফেলে না। হঠাৎ — কী দেখা যায় ওটা? যেন একটা ছায়ামূর্তি রাজকন্যাদের শিয়রের জানলার দিকে এগিয়ে আসছে? দেখতে দেখতে জানলার কপাট ছটো সরিয়ে দিয়ে সেই ছায়ামূর্তি তার একটা রাক্ষুসে হাত রাজকন্যাদের পালঙ্কের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

বীর-বাহাছুর তার ছোট ভাইদের ডেকে তুলতেই ধর্-বাহাছুর বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে ছায়ামূর্তির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে, আর কাট্-বাহাছুর তার তরোয়াল দিয়ে চোখের নিমেষে সেই হাত কেটে ছখানা করে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট আর্তনাদে রাজ্যসুদ্ধ লোকের কানে তালা ধরে যায়। জানলার বাইরে তাকিয়ে পাঁচ ভাই দেখতে পায় একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস ছুটে পালাচ্ছে; আর

যেতে যেতে গম্বুজের দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কী ব'লে যেন শাসাচ্ছে।

আওয়াজ শুনে রাজা এলেন ছুটে। এদিকে পাঁচ ভাই তখন রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে রাক্ষসটার পিছু নিয়েছে। ছেলেগুলোকে তাড়া করতে দেখে সে তখন ত্রাহি-ত্রাহি ছোটে। বিরাট রাক্ষস এক পা ফেলে তো এক রশি যায় — পুঁচকে পুঁচকে ছেলেরা তার সঙ্গে পারবে কেন? নিমেষে সে কোথায় উধাও হয়ে যায়। কিন্তু দেখ্-বাহাদুরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে সাধ্যি কার? সে ঠিক রাক্ষসটার পায়ের ছাপ দেখে দেখে ভাইদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায়।

যে-তে যে-তে রাস্তা সামনে রুখে দাঁড়ায় এক প্রকাণ্ড পাহাড়। তার ঢালু গা বেয়ে ওঠা দূরে থাক, পা রাখাই অসাধ্য কাজ। সেই অসাধ্য সাধন করে উঠ্-বাহাদুর। কোমরে তার সব সময় জড়ানো থাকে পাকানো রেশমের দড়ি। তাই নিয়ে সে তর্‌তর্ করে উঠে যায় পাহাড়ের মাথায়! তারপর দড়িটা নিচে নামিয়ে একে একে আর সব ভাইদের টেনে তোলে!

পাহাড়ের মাথার ওপর একটু এগোতেই দেখা যায় হাঁ করে আছে প্রকাণ্ড এক গুহা। আর সেই গুহার মুখে বসে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষুসী বুড়ি ডাক ছেড়ে কাঁদছে।

পাঁচ ভাই বুড়িকে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কী বুড়ি, বসে কাঁদছ কেন?'

বুড়ি আরও চিৎকার করে কাঁদে আর বলে, 'আমি কাঁদছি তোদের তাতে কী রে, ড্যাক্‌রা?'

অনেক সাধ্যসাধনার পর বুড়ি বলে, 'কাল রাতে আমার স্বামীর একটা হাত কাটা গেছে — যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে, বোধ হয় বাঁচবে না।'

শুনেটুনে পাঁচ ভাই এ-ওর দিকে চায়। তারপর বুড়িকে বলে, 'তোমার স্বামীকে আমরা ভালো করতে পারি — কিন্তু একটা শর্তে। শর্তটা এই যে, রুগীর ঘরে আমরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না! যাতে

আমাদের দাওয়াই আর কেউ শিখে নিতে না পারে, তার জন্যে এখানে যে-যে আছে সবাইকেই আমরা আগে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলব। দেখ যদি তাতে রাজী থাকো তো বল।'

রাক্ষুসী বুড়িটাও ছিল তার স্বামীর মতোই শয়তান। সে ভেবেছিল মায়াকান্নায় ভুলিয়ে ছেলেগুলোকে তার আস্তানার মধ্যে পুরবে ; তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মনের সুখে তাদের ঘাড় মটকাবে। তাই দড়ি দিয়ে বাঁধার কথাটা গোড়ায় বুড়ির তেমন পছন্দ হয় নি। সে এও ভাবল — বলা যায় না, ছেলেগুলো তার স্বামীর কাটা হাতের যন্ত্রণা হয়তো সারিয়েও দিতে পারে। তারপর তার স্বামী একবার সেরে উঠলে বাঁধন খুলতে কতক্ষণ ?

বুড়ি তাই সব দিক ভেবেচিন্তে রাজী হল। তখন ধর্-বাহাদুর শক্ত রেশমের দড়ি দিয়ে বুড়িকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে গুহার মধ্যে ঢুকল তারা পাঁচ ভাই। সেখানে রাক্ষস ছিল খাটের উপর শুয়ে। পাঁচ ভাইকে ঢুকতে দেখেই সে রাগে ফেটে পড়ল। কিন্তু একটা হাতে সে বেচারা পাঁচ-পাঁচটি জোয়ান ছেলের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ? তাকে প্রাণ দিতে হল পাঁচ ভাইয়ের হাতে। তারপর এল রাক্ষুসীর পালা। বুড়ির কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি গেল পাহাড়ের মাথায় — যেখানটায় স্তূপাকার হয়ে আছে অসংখ্য মানুষের হাড় আর কঙ্কাল।

রাক্ষস-রাক্ষুসীকে মারার পর পাঁচ ভাই চোরাকুঠুরির সন্ধান করে। গুপ্তধন পেলেও পাওয়া যেতে পারে সেখানে। প্রহরের পর প্রহর যায় কেটে, কিন্তু চোরাকুঠুরির আর খোঁজ মেলে না। চলে যাবে যাবে ভাবছে, এমন সময় দেখ্-বাহাদুর ঘরের এক কোণে দেখতে পায় ছোট্ট এক ফাটল। তার মুখ থেকে পাথরটা টেনে সরাতেই দেখা যায় লম্বা এক সুড়ঙ্গ নিচে নেমে গেছে। সেই সুড়ঙ্গ পার হয়ে পাঁচ ভাই গিয়ে পৌঁছোয় আর-একটা গুহায়।

গুহার মধ্যে ঢুকে তো তারা অবাক। সেখানে মেঝের ওপর বসে

আছে পরমাসুন্দরী দুই রাজকন্যা — রাজার সেই হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে। অনেকদিন বন্দিনী থেকে এল্‌মা গেছে শুকিয়ে ; রং হয়েছে তার ফ্যাকাশে। আর তার চেয়ে কম দিন হল এসেছে আইরিন — তাই তার এখনও চেকনাই আছে, অতটা রুগ্ন নয়। রাক্ষস ভেবেছিল পাঁচ বোনকে একে একে ধরে তারপর সবাইকে একসঙ্গে কড়মড় করে খাবে।

তাই ছাড়া পেয়ে রাজকন্যাদের আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে তারা রাজবাড়ির দিকে রওনা হয়। ঘুরপথে না এসে তারা এক সোজা রাস্তা ধরে সন্ধ্যে নাগাদ এসে পৌঁছুল রাজবাড়িতে।

হারানো মেয়েদের ফিরে পেয়ে রাজা হলেন আহ্লাদে আটখানা।

রাজ্যময় হুলুস্থূল। সারা রাত্তির ধরে রাজবাড়িতে চলল ধুমধাম। রাজা রাজসভায় দাঁড়িয়ে পাঁচ ভাইয়ের বীরত্বকাহিনী সগৌরবে বর্ণনা করলেন ; তারপর রাজা ঘোষণা করলেন সেই পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ রাজকন্যার বিয়ে দেবেন।

বিয়ের একমাস ধরে চলল অষ্টপ্রহর উৎসব। পাঁচ কনের অঙ্গে উঠল সোনারুপোর জরি-দেওয়া আর চুনিপান্নার চুমকি-বসানো সাজ। পাঁচ ভাই রাজসরকারে নিজের নিজের গুণ অনুযায়ী পাঁচটি পদ পেল। সুখে শান্তিতে কাটতে লাগল তাদের জীবন। তারপর রাজা মারা যাবার পর বীর-বাহাদুর হল রাজা আর এল্‌মা হল রানী। সেই রাজারানীর সুখ্যাতি আজও তোমরা শুনতে পাবে।

রু পো দে ব তা

আজও যদি স্পেনদেশের কোনো খনিতে গিয়ে নামো, ভুতুড়ে কাণ্ড দেখতে পাবে। অন্ধকারে কোথাও কেউ নেই, শুনতে পাবে কয়লা চটানোর শব্দ। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠবে, যখন দেখবে অলক্ষ্যে কারা যেন ঝুড়ি-ঝুড়ি কয়লা এনে রাখছে তোমার সামনে। কোনো খনিমজুরকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, এসব খনি কি আজকের? ব'লে সে হয়তো তোমাকে বাইবেলের গল্প শুনিয়ে ছাড়বে — সেই যখন জোনা আসছিলেন স্পেনদেশে, একটা তিমি মাছ এসে তাঁকে গপ্ করে গিলে ফেল্‌ল। জোনা যে স্পেনদেশেই আসছিলেন, তার এই যুক্তিও সে হয়তো দেবে — সেভিলের কাছে যে খনিটাকে আমরা বলি রিও টিণ্টো, সেকালে তারই নাম ছিল টারশিস্। একেবারে নাকি অকাট্য যুক্তি। সে যাই হোক, স্পেনদেশের খনি-গুলো যে পুরনো এতে সন্দেহ নেই! এখনও খনির মধ্যে কাজ করতে করতে গাঁইতির মুখে উঠে আসা আদ্যিকালের আজব সব কলকব্জা দেখতে পাওয়া যায়। কোনোটা ওক কাঠে, কোনোটা তামার পাতে তৈরি।

অনেকদিন আগের কথা। স্পেনের যে দিকটায় পাহাড় আর বড় বড় বাঘসিংহের জঙ্গল, সেখানটাতে থাকত এক গরিব সহিস। নাম অ্যান্টনিও। অ্যান্টনিওর মনিব একজন বড় দরের ব্যাপারী। খচ্চরের ব্যবসায়ে লোকটা টাকার পাহাড় তুলেছে। অ্যান্টনিও ছিল তার মনিবের ভারি বিশ্বাসী। কাজে এক মুহূর্ত ফাঁকি দিত না সে। তাই উত্তরের হাটবাজারে বিক্রির জন্যে খচ্চরের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল অ্যান্টনিওর কাজ। কাজটা খুবই খাটুনির। কিন্তু অ্যান্টনিওর মনিব ভারি সেয়ানা লোক। একেবারে যাকে বলে হাড়-কিপ্টে। অ্যান্টনিও গাধার মতো সারাদিন খেটে যা পেত, তাতে একবেলাও ভালো করে তার খাওয়া জুটত না। সব সময় পেটে তার ক্ষিধের আগুন জ্বলত। এমনি করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়।

অ্যান্টনিওর বাপ-দাদার ভিটে ছিল মালাগায়। সেখানকার সমতলে মাঠে মাঠে সোনা ফলে। সেই মালাগায় থাকে ছবির মতো দেখতে একটি মেয়ে। নাম তার রোজিটা। মেয়েটিকে অ্যান্টনিওর খুব পছন্দ। রোজিটাও ভারি গরিব। বেশির ভাগ দিনই তাকেও খালি পেটে রাত কাটাতে হয়। অনেকদিন থেকে সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু অভাবের জ্বালায় হয়ে ওঠে না।

গরমের দিনে তারায় ভরা আকাশের নিচে ঘুমন্ত খচ্চরগুলোর পাশে পড়ে থাকত অ্যান্টনিও। শীতের রাত্তিরে কপালগুণে যেদিন জুটে যেত কোনো সরাইখানা, সেদিন ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে পোয়াতে অ্যান্টনিও ভাবত রোজিটার কথা। রাস্তায় বেরিয়ে কোনো-দিন হয়তো এল মুষলধারে বৃষ্টি কিংবা তুষার — কাছে-পিঠে কোনো মাথা গুঁজবার চটিও নেই। ঝোপঝাড়ে মাথা গলিয়ে কাটাতে হয় রাত্তির — জমে বরফ হয়ে যায় হাত-পা। কোনোদিন মাথার ওপর পাহাড়ের ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটা গুহা জুটে যায়।

শীত তো আর বছরের বারো মাস থাকে না। একদিন এল গরম-

কালের এক স্নিগ্ধ রাত্তির। পাহাড়তলীর মাঠে খচ্চরগুলোকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল অ্যান্টনিও। মাথার ওপর নীল টলটল করছে আকাশ। চারিদিকে হেসে উঠছে জ্যোৎস্না। ঝরনার ধারে একটা নাম-না-জানা গাছের ডালে গান ধরেছে বুলবুল। আনন্দের বান ডেকেছে যেন।

শুয়ে শুয়ে অ্যান্টনিও স্বপ্ন দেখে — মালাগায় ছোট্ট সংসার পেতেছে সে। কুঁড়েঘরে রাজারানী হয়ে আছে সে আর রোজিটা। গরিবের শাকান্নও তাদের রাজভোগ বলে মনে হয়।

শেষরাত্রে অ্যান্টনিও ঘুম ভেঙে দেখে দ্বাদশীর চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। আবছা আবছা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সারা তল্লাট।

হঠাৎ কালো পাহাড়ের নিচে অন্ধকারে চোখ পড়তেই অ্যান্টনিও
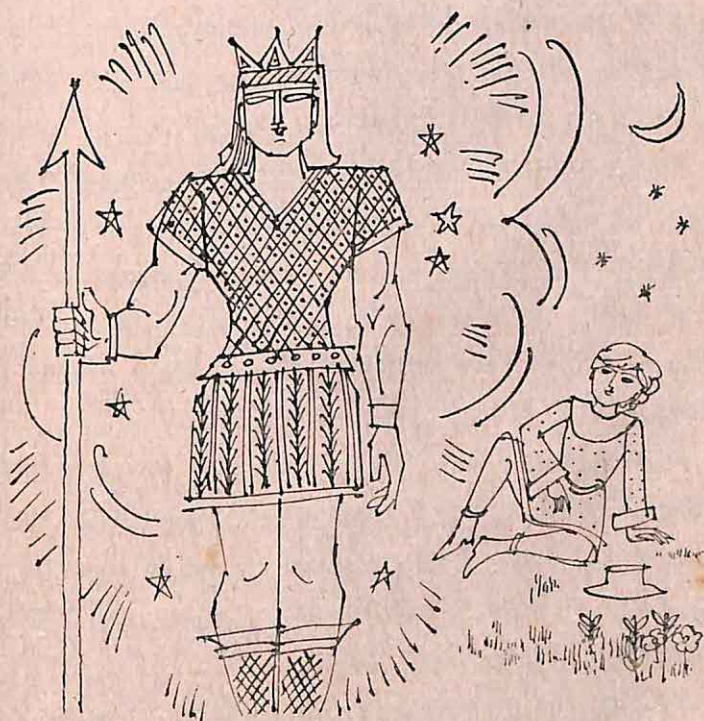
অবাক হয়ে উঠে বসে। ঢালু পাহাড়ের গায়ে রুপোর মতো চিকচিক করছে কী ওটা? রুপোর নদী বলেই তো মনে হয়। পাহাড়ের মাথার ওপর ও কার ছায়ামূর্তি? গায়ে তার জ্বলজ্বল করছে রুপোর বর্ম; হাতে আলগোছে ধরা রুপোর বর্শা। আস্তে আস্তে সেই বীরপুরুষ পাহাড়ের পথ ভেঙে নেমে আসছে তার দিকে। অ্যাণ্টনিওর মনে হল, নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছে। তার চোখ জুড়ে আসছিল ক্লান্তিতে। ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ে অ্যাণ্টনিও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তবু ঘুম-চোখে অ্যাণ্টনিওর কানে এল, কে যেন তাকে ডেকে বলছে —

'মনে রেখো, যেখানে রুপোর নদী দেখেছ, জায়গাটা ঠিক মনে রেখো। আর কোনো অভাব থাকবে না তোমার। পায়ে পা তুলে কাটাতে পারবে বাকি জীবনটা। আমি হচ্ছি রুপোদেবতা। বছরে বিশেষ কয়েকটা দিনে আমি দর্শন দিই; যারা প্রকৃতই সাধু পুরুষ, শুধু তারাই আমাকে দেখতে পায়। আমাকে মনে রেখো। আমি তোমার সহায় হব।'

সকালে ঘুম ভাঙতেই অ্যাণ্টনিও আগে তাকায় পাহাড়টার দিকে — ঠিক যেখানটায় সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল রুপোদেবতাকে আর দেখেছিল রুপোর নদী। কিন্তু দিনের আলোতেও পাহাড়টা আগের মতোই কালো কুয়াশায় ঢাকা বলে মনে হয়। অ্যাণ্টনিও ভাবে, নিশ্চয় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছি কাল। তারপর খচ্চরগুলোকে নিয়ে রওনা হয়।

অনেকটা রাস্তা। একা একা হাঁটতে হাঁটতে রাত্তিরের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে অচেনা গলায় কানের কাছে ফিস-ফিস করে বলা কথাগুলো: 'মনে রেখো। যেখানে রুপোর নদী দেখেছ, জায়গাটা ঠিক মনে রেখো। আর কোনো অভাব থাকবে না তোমার। পায়ে পা তুলে কাটাতে পারবে বাকি জীবনটা।'

কিন্তু অ্যাণ্টনিও ভেবেই পায় না রুপোদেবতা তাকে বড়লোক

করবেন কী করে ! রুপোদেবতা নিজেই তো বলেছেন, সব দিন তিনি দর্শন দেন না। বিশেষ দিনক্ষণ আছে। মনিবের কাজে উদয়াস্ত সারা দেশ তাকে চষে বেড়াতে হয়। কোন্‌দিন কোথায় থাকে ঠিক কী? আবার যেদিন রুপোদেবতা দর্শন দেবেন, সেদিন এ তল্লাটেই থাকবে না অ্যাণ্টনিও। আর যদি দেখাই হয়, তাতেই বা কী? অ্যাণ্টনিওকে কি তিনি গুপ্তধনের খোঁজ বলে দেবেন ?

ভাবতে ভাবতে গঞ্জের রাস্তায় এসে পড়ে অ্যাণ্টনিও। রাস্তায় হাটুরের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে কোথায় তার ভাবনা মিলিয়ে যায়। চেনাশুনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়। কোন্ মেলায় কে কি দেখেছে তার গল্প হয়। রেশম কিংবা ডিমের পসরা নিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে যায় মেয়েরা। দামী ঘোড়ায় চড়ে হাটে যায় পয়সাওয়ালা চাষীর দল।

হাটে বেচাকেনা শেষ করে অ্যাণ্টনিও কোমরে টাকার থলি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। তার ইচ্ছে ছিল মেলা দেখে যাবে একটা দিন থেকে। সরাইখানায় থাকলে অনেকের সঙ্গে দেখাও হত। রাত্তিরটা থাকলে বাজি পোড়ানো দেখে যেতে পারত। কিন্তু অ্যাণ্টনিও মনিবের কাছ থেকে যা মাইনে পায়, তাতে ফুর্তির জন্যে একটা দিনও গাঁটের পয়সা খরচ করা চলে না তার। তাছাড়া এখানে একটা দিন থাকলে সময়মত ফেরাও যাবে না। কাজেই দুর্গা বলে রওনা হয় অ্যাণ্টনিও।

যেতে যেতে সেই পাহাড়তলীতে পৌঁছয়, যেখানে সে আগের দিন রাত কাটিয়েছিল। সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। কিন্তু ক্লান্তিতে পা দুটো ভারী হয়ে আসে অ্যাণ্টনিওর। কালো পাহাড়টায় চোখ পড়তেই মনে পড়ে গেল রুপোদেবতার কথা। আর কি অ্যাণ্টনিও দেখা পাবে তাঁর? ভাবতে ভাবতে রাতটা সেই পাহাড়তলীতেই কাটাবার ব্যবস্থা করে।

এমন সময় অ্যাণ্টনিও দেখতে পেল লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে এক বুড়ো দরবেশ। গায়ে তার পাঁশুটে রঙের

আলখাল্লা। হেঁটে হেঁটে ফোস্‌কা পড়েছে দুই পায়ে।

লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে অ্যান্টনিওকে বলে: 'আমাকে এই চড়াইটা পার করে দেবে, বাছা? আমি এক ফকিরের সঙ্গে দেখা করব বলে বেরিয়েছি। কিন্তু হেঁটে হেঁটে পা দুটো ধরে গেছে। তোমার খচ্চরটা একটু ধার দিতে পার বাছা? যা চাও, তাই দেব।'

অ্যান্টনিও তার উত্তরে বলে, 'না, না কিছু দিতে-টিতে হবে না; তবে এ খচ্চরটা আমার নিজের নয়; আমার মনিবের খচ্চর এটা। আপনাকে দিলে আমাকে আবার এখনই সঙ্গে যেতে হয়। সারা দিন খেটে-খুটে আমারও এখন আর শরীর বইছে না।'

বুড়ো দরবেশ মিষ্টি করে বলে, 'তা বাছা, তুমি সঙ্গে গেলে তো ভালোই হয়। যদি একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে যাও, তোমাকে আমি ভালো রকমের বখশিশ দেব।'

অ্যান্টনিও ভাবল, হাজার হোক তার জোয়ান বয়েস; একটু না হয় কষ্ট হলই বা। তাছাড়া বুড়ো দরবেশ যেদিকটায় যাবে, সেদিক-টাতেই তো সে কাল রাত্তিরে রুপোর নদী চিকচিক করতে দেখেছিল।

এই ভেবে বুড়ো দরবেশকে খচ্চরের ওপর চড়িয়ে নিজে সে হেঁটে রওনা হয় পাহাড়ের দিকে। যাবার আগে তল্পিতল্পাগুলো এক ঝোপের নিচে লুকিয়ে রেখে যায়।

অর্ধেক রাস্তায় এসে বুড়ো দরবেশ খচ্চর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অ্যান্টনিওকে বলে, 'ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানে একটু অপেক্ষা করো। ততক্ষণে আমি যদি ফিরে না আসি, বুঝবে আর দরকার নেই। তোমরা তখন চলে যেও।'

এই বলে সামনের বাঁকা রাস্তা ধরে বুড়ো দরবেশ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

অ্যান্টনিওর তখন মনে পড়ল, বুড়ো দরবেশ বখশিশ দেবার কথা বলেছিল। কিন্তু যাবার সময় বুড়ো তো সে সম্বন্ধে আর রা করল না।

অ্যাণ্টনিও মনে মনে একটু দুঃখ পেল। বুড়ো দরবেশের কথা মনে হতেই কাল রাত্তিরের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এখানটাতেই না সে রুপোর নদী দেখেছিল কাল? অ্যাণ্টনিও ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কে বলতে পারে, যদি সে গুহার মধ্যে কোথাও গুপ্তধন কিংবা পাথরের নুড়ির মধ্যে তাল তাল রুপো পেয়ে যায়! কিন্তু অ্যাণ্টনিওকে হতাশ হতে হল। না পাওয়া গেল গুপ্তধন, না পাওয়া গেল রুপোর তাল। পাথরের নুড়িগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেখল, যদি তার মধ্যে সোনারুপো কিছু মেলে। কিছুই পাওয়া গেল না দেখে বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যাণ্টনিও।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বুড়ো দরবেশ তখনও ফিরে আসে নি। একটা উঁচু গাছের ডালে উঠে দরবেশের নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করল অ্যাণ্টনিও। কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না। বুড়ো দরবেশ তাকে এভাবে ঠকাবে সে ভাবতেই পারে নি।

পাহাড়তলীতে ফিরে এসে খচ্চরের পিঠে তল্পিতল্পা চাপাতে গিয়ে দেখে বেজায় ভারী লাগছে। খুলে দেখে তার মধ্যে পাথরের বড় বড় নুড়ি ঠিক অবিকল পাহাড়ের ওপরকার কালো নুড়িগুলোর মতো। নুড়িগুলো দূর করে ফেলে দিতে যাচ্ছিল অ্যাণ্টনিও; এমন সময় বুড়ো দরবেশের কথাগুলো মনে পড়ল, 'ভালো রকমের বখশিশ দেব তোমাকে।' সেই সঙ্গে রুপোদেবতার কথাও মনে পড়ল, 'মনে রেখো। যেখানে রুপোর নদী দেখেছ, জায়গাটা ঠিক মনে রেখো। আর কোনো অভাব থাকবে না তোমার। পায়ে পা তুলে কাটাতে পারবে বাকি জীবনটা।' মনে পড়তেই কী ভেবে সে পাথরের নুড়িগুলো বোঁচকার মধ্যে পুরে রওনা হল মনিববাড়ির দিকে।

ফিরে গিয়ে অ্যাণ্টনিও তার মনিবের কাছে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলল। পাথরগুলো হাতে নিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল; কালো পাথরের বুকে সাদা সাদা কিসের যেন দাগ। অ্যাণ্টনিওর মনিবের

এক বন্ধু রুপোর বড় খনিতে চাকরি করত। পাথরগুলো নিয়ে অ্যান্টনিওর মনিব তার সেই বন্ধুর কাছে গেল। বন্ধুটি পাথরগুলো দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ জায়গাকার পাথর এগুলো?' অ্যান্টনিওর মনিব বলতে পারল না ওগুলো কোথাকার পাথর। সে এসে অ্যান্টনিওকে জিজ্ঞেস করল। অ্যান্টনিও অত বোকা নয় যে, চট করে তার মনিবকে সেই পাহাড়টার নাম বলে দেবে। সে অবশ্য জানত তার মনিবের বন্ধুটি খুব সাচ্চা লোক। তাই সে বলল, 'জায়গার নাম আমি বলব না। তবে আপনার বন্ধুর কাছে শুধু এইটুকু বলতে পারি কী রকমের সে জায়গাটা।'

মনিবের সেই বন্ধুটি সব শুনেটুনে অ্যান্টনিওকে এক থলি মোহর দিল আর বলল, যদি সেখানে সত্যিই খনি পাওয়া যায়, তাহলে আরও ঘড়া ঘড়া মোহর দেবে সে অ্যান্টনিওকে।

তখনই তাদের নিয়ে অ্যান্টনিও রওনা হল সেই পাহাড় দেখাতে। যেখানে সে রুপোর নদী দেখেছিল, ঠিক যেখানটায় দরবেশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেইখানে খুঁড়তে খুঁড়তে একটা প্রকাণ্ড রুপোর খনি পাওয়া গেল।

আর তার জন্যে ঘড়া ঘড়া মোহর পেল অ্যান্টনিও। মনিবের কাজে ইস্তফা দিয়ে মালাগায় গিয়ে অ্যান্টনিও আর রোজিটা সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগল।

কুজমার ক'নে

এক যে ছিল বুড়ো, তার ছিল তিন ছেলে — বড় মিটিয়াই, মেজ লেন্টিয়াই আর ছোট কুজমা। বড় আর মেজ ছেলে কুঁড়ের জাশু, বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমোয় আর সাদা সাদা ফুলকো ফুলকো লুচি গোগ্রাসে গেলে। পুজোপার্বণের দিন বড়ভাই আর মেজভাই সিল্কের ফিনফিনে শার্ট গায়ে দিয়ে বুক টান করে ঘুরে বেড়ায়, ছোটভাই কুজমার ভাগ্যে জোটে শুধু চটের মতো মোটা একটা ছিটের ফতুয়া।

বুড়োর এদিকে জীবনদীপ নিভে আসে। একদিন সে চোখ বোঁজে। তার সম্পত্তির মধ্যে একটা ঘর, একটা ঘোড়া আর একটা কটা-রঙের বেড়াল — এই সে রেখে গেল। বড় ছেলে নিল ঘর, মেজ নিল ঘোড়া আর ছোটর ভাগ্যে জুটল বেড়াল।

বড়ভাই আর মেজভাই ছোটভাইকে ডেকে বলল, 'যাও বেড়াল নিয়ে তুমি এখান থেকে দূর হয়ে যাও। তোমাকে আমরা খেতে দিতে পারব না।'

ছোট হওয়ার এত দুঃখ! এত গঞ্জনা! এ দুঃখের শেষ করতেই হবে — এই ভেবে ছোটভাই কুজমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে

বেড়ালটাকে বুকে করে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে একদিন সে প্রকাণ্ড এক শহরে এসে উপস্থিত। সেই শহরে থাকেন জার। তিনি রুশদেশের রাজা। তাঁর বিশাল রাজপুরী। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওপরে চোখ পড়তেই কুজমা দেখে জানলায় বসে রাজকন্যা মারিয়া মারিয়েভ্‌না। রূপবতী রাজকন্যা জানলায় বসে আখরোট ভাঙছেন। দেখে তো কুজমার ভারি পছন্দ হয়ে গেল। সে সটান গিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত — রাজকন্যাকে সে বিয়ে করতে চায়। কুজমা বলল, 'রাজামশাই, আমি রাজকন্যা মারিয়াকে বিয়ে করতে চাই।'

রাজা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কুজমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'এ আবার কেমনধারা কথা? চাল নেই চুলো নেই, কোথাকার এক চাষীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে — এমন কথা কেউ সাত জন্মেও শোনে নি। এক্ষুনি ভালোয় ভালোয় বিদায় হও এখান থেকে, নইলে চাবুক মেরে তাড়াব।'

কুজমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে রওনা দিল। তারপর মনের দুঃখে বনের মধ্যে নিজের যুগ্যি ছোট্ট একটা ঘর তুলে সেখানে বাস করতে লাগল।

একদিন কটা-রঙের বেড়ালটা বলল, 'কুজমা, তুমি দুখ্যু কোরো না। কেঁদো না তুমি, আমি তোমার সহায় হব। তুমি আমার জন্যে আগে তো একটা পুরুষ্টু দেখে ভারুই পাখি এনে ভালো করে তার ঝোল রেঁধে দাও — তারপর কী করা না করা ভেবেচিন্তে দেখা যাবে।

এই কথা শুনে কুজমা ফাঁদ পেতে এক ভারুই পাখি ধরল। তারপর রান্নাবান্না করে কটা-রঙের বেড়ালটাকে চর্ব্যচূষ্য করে খাওয়াল। বেড়ালটা এত খেল যে, গোঁফজোড়া তার চর্বিতে চকচক করতে লাগল। তারপর সে ছুটে গিয়ে মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর রোদ্দুরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ম্যাও ম্যাও করতে লাগল। এমন সময় এক রাঙা শেয়াল ছুটতে ছুটতে এসে হাজির:

'কটা-বেড়াল, ও কটা-বেড়াল ভাই! কোত্থেকে এত খেয়েদেয়ে এলে?'

'রাজার বাড়িতে যে আজ নেমন্তন্ন ছিল। সে কি শেয়াল ভাই, তোমাকে নেমন্তন্ন করে নি?'

'আমাকে একবারটি ওবেলা রাজবাড়িতে নিয়ে চলো না ভাই, নেমন্তন্ন খেতে!'

'কেন নিয়ে যাব না? নিশ্চয় নিয়ে যাব। তুমি একটা কাজ করো। আরও শতখানেক রাঙা শেয়াল জুটিয়ে আনো। সবাই আমরা দল বেঁধে যাব। নইলে রাজা তো আর তোমার একার জন্যে ভিয়েন বসাতে পারেন না।'

তখন ছুটে গিয়ে সে আরও একশোটা রাঙা শেয়ালকে ডেকে

আনল। কটা-রঙের বেড়াল তখন তাদের নিয়ে চলল রাজার কাছে। দেউড়িতে তাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে একা সে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'রাজা মশাই, রাজা মশাই! আমার মনিব কুজমা চাষী আপনার জন্যে যৎসামান্য ভেট পাঠিয়েছেন — একশোটা শেয়াল। ওতে আপনার দামী পশমের গরম কোট হতে পারবে।' শুনে রাজা তো মহা খুশি।

তিনি বললেন, 'তোমার মনিবটি তো তাহলে খুব পয়সাওয়ালা লোক হে, — তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে বড়ো খুশি হতাম।'

কটা-রঙের বেড়াল জবাব দেয়, 'রাজামশাই, হাজার হোক তিনি চাষীর ছেলে। রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকা তাঁর সাজে না।'

রাজা বলেন, 'ওতে কিছু আসে যায় না। চাষী হোক, টাকা তো আছে।'

শেয়ালগুলোকে গোলাবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে রাজা হুকুম দিলেন। আর কটা-রঙের বেড়াল তখন বনে ফিরে গিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে আবার ম্যাঁও ম্যাঁও করে।

এমন সময় কোত্থেকে এক সোনালী বেজি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির:

'ও কটা-বেড়াল, বলি কার বাড়িতে অত খেয়েদেয়ে পেটমোটা করে এলে?'

'রাজার বাড়িতে যে নেমন্তন্ন ছিল আজ। কত সব বেজি এসে-ছিল, আরও কত যে জন্তুজানোয়ার তার ঠিকঠিকানা নেই। এখনও অনেকে সেখানে বসে আছে, এখনও সব পাতে বসে খাচ্ছে।'

'ও কটা-বেড়াল, কটা-বেড়াল ভাই,— আমায় নিয়ে চলো না। আমিও রাজার সঙ্গে বসে খাব।'

'একা তোমার জন্যে রাজা অত হাঙ্গমা পোয়াতে যাবেন কেন? তবে তুমি যদি আরও একশোটা বেজিকে সঙ্গে আনতে পারো, আমি

তোমাদের সবাইকে তখন রাজার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি।’

এই না শুনে বেজি গিয়ে এক লাফে আরও একশোটা বেজিকে ডেকে নিয়ে এল। তারপর সেই কটা-রঙের বেড়াল তাদের সবাইকে নিয়ে রাজবাড়িতে চলল।

‘রাজা মশাই, রাজা মশাই! ভালো তো? কুজমা চাষী আপনার জন্যে যৎসামান্য ভেট পাঠিয়েছে — একশোটা বেজি। তাতে আপনার একটা ভালো কম্বল তৈরি হতে পারবে।’

রাজা তো আনন্দে আটখানা।

‘কী বড়লোক মনিব তোমার হে! আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই। তিনি স্বয়ং যেন আমার ভোজসভায় আসেন।’

‘তথাস্তু।’ —এই বলে বেড়াল তখনই ছুটতে ছুটতে গরিব চাষী কুজমার কাছে এসে হাজির। ‘চল, রাজার বাড়িতে আজ আমাদের নেমন্তন্ন।’

‘তুমি কি পাগল হয়েছ? আমার সাজ নেই, পোশাক নেই, খালি পা, গায়ে শুধু একটা মোটাছিটের জামা।’

‘থাক্ না, ওতে কিছু যাবে-আসবে না।’

তারপর তারা দুজনে রাজবাড়ির দিকে রওনা হল। পথে একটা নদী পার হতে হবে। বেড়াল কুজমাকে ডেকে বলে, ‘রাজার বাড়িতে যাবার আগে তোমাকে স্নান করে নিতে হবে, কুজমা! নদীতে নেমে পড়, জল বেশ গরম আছে।’

কুজমা জামাকাপড় খুলে জলে নেমেছে, এমন সময় বেড়াল এক কাণ্ড করে বসল। কুজমার জামাকাপড় জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর ছুটতে ছুটতে রাজবাড়িতে গিয়ে কেঁদে পড়ল: ‘রাজা মশাই, আমার মনিব গাড়িতে করে আপনার ভোজসভায় আসছিলেন। এমন সময় অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে একদল ডাকাত আমাদের তাড়া করে। তারা আমার মনিবের পরনের কাপড়টুকু পর্যন্ত খুলে নিয়ে তাঁকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এখন তিনি

নদীর ধারে বসে। কাপড়ের অভাবে রাজবাড়িতে আসতেও পারছেন না।'

রাজা সব শুনে দুঃখ করে বললেন, 'আহা বেচারা!' তারপর হন্তদন্ত হয়ে কুজমার জন্যে ভালো ভালো সাজপোশাক পাঠিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে কুজমাকে আনার জন্যে পাঠালেন সোনার তৈরি রথ।

সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে এমনভাবে কুজমা রথে চড়ে রাজার ভোজসভায় এল যেন সে একজন মস্ত কেউকেটা। রাজা তাকে তার উপহারের জন্যে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাকে টেবিলের ধারে খাতির করে বসালেন। তিন-তিন সপ্তাহ আর তিন-তিনটি দিন ধরে খানাপিনা চলল। তারপর রাজা বললেন, 'অতিথি মশাই, আপনাদের বাড়িতে গিয়ে এবার চলুন নেমন্তন্ন খেয়ে আসি।'

কুজমা ভাবল, 'গিয়েছি এবার, আর রক্ষে নেই; রাজাকে এখন আমি কী করে কুঁড়েঘরে নিয়ে যাই?'

কিন্তু বেড়াল বলল, 'বেশ তো রাজা মশাই, আপনি একদিন দয়া করে আমাদের প্রাসাদে আসুন না।' তারপর সে তার মনিবকে ফিস্-ফিস্ করে বলে, 'কোনো চিন্তা নেই কুজমা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কুজমার কিছু করার ছিল না। কলে পড়েছে; না গিয়ে তার উপায় নেই। রাজা তখন রথের সঙ্গে ঘোড়া জুড়ে রাজকন্যা আর কুজমা চাষীকে নিয়ে বড় রাস্তা ধরে হাঁকিয়ে চললেন।

কটা-রঙের বেড়াল কিন্তু তাঁদের আগে আগে ছুটল। ছুটতে — ছুটতে — সে দেখে একদল রাখাল একপাল ভেড়া চরাচ্ছে।

'রাখাল ভাই, রাখাল ভাই — তোমরা ভেড়া চরাচ্ছ কার?'

'গোরিনিচের।'

'রাখাল ভাই, রাখাল ভাই! কাউকে যেন বোলো না তোমরা গোরিনিচের ভেড়া চরাচ্ছ। জিজ্ঞেস করলে বলবে — ভেড়ার মালিক কুজমা চাষী। নইলে — গোরিনিচকে আক্রমণ করতে আসছেন রাজা অগ্নি আর তাঁর মেয়ে বজ্রলেখা — তাঁরা শুনলে তোমাদের আস্ত

রাখবেন না।'

শুনে রাখালরা তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

বলল, 'তথাস্তু।'

কটা-রঙের বেড়াল আরও এগিয়ে যেতে একদল সহিসের সঙ্গে দেখা। তারা একপাল ঘোড়া চরাচ্ছে।

'সহিস ভাই, সহিস ভাই — তোমরা ঘোড়া চরাচ্ছ কার?'

'গোরিনিচের।'

'সহিস ভাই, সহিস ভাই — খবরদার কাউকে যেন বোলো না তোমরা গোরিনিচের ঘোড়া চরাচ্ছ। জিজ্ঞেস করলে বলবে — ঘোড়ার মালিক কুজমা চাষী। নইলে — গোরিনিচকে আক্রমণ করতে আসছেন রাজা অগ্নি আর তাঁর মেয়ে বজ্রলেখা — তাঁরা শুনলে তোমাদের আস্ত রাখবেন না।'

সহিসরা তো ভয়ে অস্থির।

বলল, 'তথাস্তু।'

কটা-রঙের বেড়াল আরও এগিয়ে চলল। যে-তে যে-তে যে-তে একেবারে সটান গোরিনিচের প্রাসাদে এসে হাজির।

'কি গো কটা-রঙের বেড়াল — খবর কী?'

'গোরিনিচ ভাই, সর্বনাশ হয়েছে! — রাজা অগ্নি আর তাঁর মেয়ে বজ্রলেখা আসছেন তোমাকে আক্রমণ করতে। তাঁরা তোমাকে পুড়িয়ে মারতে চান।'

গোরিনিচের তো ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে আসে।

'ও কটা-বেড়াল, এখন আমি করি কী?'

'বাঁচতে চাও তো, এখুনি পালাও। খবরদার, পেছনে যেন ফিরেও তাকিও না।'

গোরিনিচ পাহাড় ডিঙিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

ওদিকে রাজা আর রাজকন্যাকে নিয়ে তো রথে চড়ে কুজমা

আসছে। রাস্তায় একপাল ভেড়ার সঙ্গে দেখা।

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে — কার ভেড়া?'

'কুজমা চাষীর।'

রাজা তো ভারি খুশি।

'তোমার তো দেখছি ভাই, দারুণ অবস্থা!'

যে-তে যে-তে ঘোড়ার পালের সঙ্গে দেখা।

'সহিস, সহিস — কার ঘোড়া?'

'কুজমা চাষীর।'

রাজা বলেন, 'কুজমা, তোমার কত ঘোড়া!'

তাঁরা সোনা-দিয়ে-মোড়া এক প্রাসাদের সামনে এসে হাজির হলেন। কটা-রঙের বেড়াল এসে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

'আসুন, বসুন — গরিবের কুঁড়েঘর আপনাদের পায়ের ধুলোয় ধন্য হোক।'

রাজা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁ হয়ে গেলেন। বললেন, 'আহা কী সুন্দর, কত দামী জিনিস সব! কুজমা, তুমি ইচ্ছে করলে রাজকন্যা মারিয়াকে বিয়ে করতে পারো। আমার মেয়েকে তোমার ধর্মপত্নী করো।'

কিন্তু কুজমা জবাব দিল:

'রাজকন্যার সঙ্গে চাষীর বিয়ে? এমন অদ্ভুত কথা কে কবে শুনেছে? না, তা হয় না। তার চেয়ে আমার এখানে থাকুন-টাকুন খান-দান — ফুর্তি করুন। কিন্তু বিয়ে করব আমি চাষীর মেয়েকে।'

রাজা তো চটে লাল। খেতে পর্যন্ত রাজী হলেন না। মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন।

আর এদিকে কুজমা এক চাষী-মেয়েকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগল।

হাওয়াসুর

এক দেশে এক গাঁয়ে ছিল গরিব এক চাষী। খড়-ঝুরঝুরে দেয়াল-নড়বড়ে ছোট্ট তার কুঁড়ে। নিজের বলতে তার একজোড়া ছেঁড়া-খোঁড়া জুতো; আর সম্পত্তির মধ্যে শুধু একটা বেড়াল। তা সেটাও একদিন যেদিকে দুচোখ যায় চলে গেল।

একদিন সে পাদ্রী-বাড়িতে মুনিষ খাটতে গেল। চৌপর দিন কাজ করল এক দণ্ড না জিরিয়ে; মজুরি পেল এক আড়ি আকাঁড়া ধান।

সেই ধান ঝাড়াই করতে সে এক মাঠে গিয়ে দাঁড়াল। এমন সময় দমকা হাওয়া এসে চেঁছেপুঁছে সব ধান তার উড়িয়ে নিয়ে গেল। বেচারা চাষী তো রেগে আগুন। বলল:

'হাওয়াকে যদি কান ধরে না পাকড়াই তো আমি বাপের ব্যাটা নই। রক্ত-জল-করে-পাওয়া ধান আমার — দমকা হাওয়া আমায় পথে বসাল। অমনি ছাড়ছি না আমি — খেসারত নেব তবে ছাড়ব।'

এই বলে সে বাড়ি থেকে রাস্তায় পা দিতে যাবে, এমন সময় তার বউ হাঁ হাঁ করে এল: 'বলি যাচ্ছ কোন্ চুলোয়?'

'যাচ্ছি হাওয়ার খোঁজে। সে শয়তান আমার সব ধান উড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

'তোমার মাথায় ভূত চেপেছে নাকি? মনে নেই কথায় আছে— হাওয়াকে খুঁজবে কোথায়, না ভুঁয়ে! তুমি ছুটবে এক রাস্তায়, হাওয়া ছুটবে দ্বাদশ রাস্তায়। হাওয়ার নাগাল তোমাকে পেতে হয় না।'

'হাওয়াকে আমি যেমন করে পারি খুঁজে বার করব। খালি হাতে আমি ঘরে ফিরব না।'

বউকে 'আসি' বলে ছেলেমেয়েদের চুমু খেয়ে সে হাওয়ার খোঁজে মাঠে বেরিয়ে পড়ল।

যে-তে যে-তে যে-তে সামনে এক জঙ্গল পড়ল। জঙ্গলে মুরগীর ঠ্যাঙের ওপর দাঁড়ানো এক কুঁড়েঘর। ঘরের মেঝেতে হাত-পা টান-টান করে শুয়ে আছে কটা রঙের দাড়িওয়ালা এক বিরাট দৈত্য। মাথা তার বেঞ্চিতে হেলান দেওয়া; হাত দুটো আর পা দুটো তার ঘরের চার কোণে ছড়ানো। কটা দাড়ি গিয়ে মটকায় ঠেকেছে।

বুড়ো দৈত্যকে দেখে এদিকে গরিব চাষী বেচারার আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

'দাঠাকুর, পেন্নাম হই।'

'বোসো, বোসো — তা যাওয়া হচ্ছে কত দূর?'

'আজ্ঞে, আমি মাঠের হাওয়ার খোঁজে বেরিয়েছি।'

'তা হঠাৎ হাওয়ার খোঁজে কেন?'

'কেন? সে আমার বড্ড ক্ষতি করেছে। দুমুঠো ধানের জন্যে দু-দুটো মাস মাথার ঘাম পায়ে ফেললাম। মাঠে গিয়ে সেই ধান যখন ঝাড়তে গেলাম, হাওয়া এসে সব ধান উড়িয়ে নিয়ে গেল। আপনিই বলুন এতে রাগ হয় না? দুখ্যু হয় না? বড়লোকদের গোলা-ভরা ধান থাকে; আর আমার ছিল শুধু এক আড়ি ধান — পোড়া কপাল আমার, তাও হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল!'

'আচ্ছা বৎস, বুঝেছি। তোমাকে আর আমি বকাতে চাই না।

মাঠে মাঠে আর তুমি হাওয়ার খোঁজে ঘুরে বেড়িও না। আমিই সেই হাওয়াসুর। তোমার যা ক্ষতি হয়েছে, তার বদলে তোমাকে এই কৌটো দিচ্ছি। যে-সে কৌটো নয়, ভানুমতীর কৌটো। যখনই তোমার ক্ষিধে-তেষ্টা পাবে, অমনি কৌটোর কাছে মুখ নিয়ে মন্তর বলবে,—

"ভানুমতীর কৌটো, ভাই।
পাই যদি, ক্ষীরপোলাও খাই" ॥'

এমন একটা কৌটো পেয়ে চাষীর ভারি ফুর্তি। সে বুড়ো দৈত্যের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

'দাঠাকুর, আপনার দয়ার শরীর। আপনার অনুগ্রহ কখনও ভুলব না। আচ্ছা, একটা কথা দাঠাকুর— আর খেটে খেতে হবে
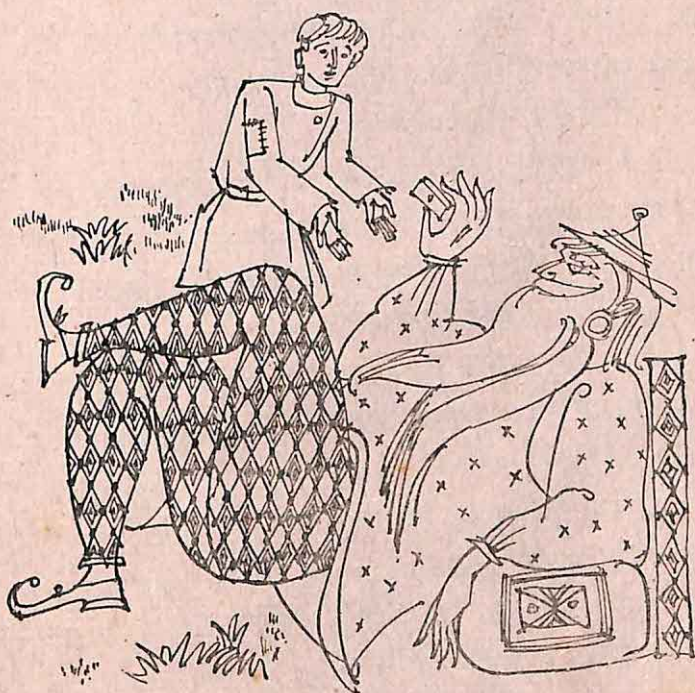
না তো ? বসে বসেই পেট ভরবে তো ?'

'কুঁড়ের বাদ্‌শাদের পক্ষে এই কৌটোয় ভারি আরাম। তবে দেখো, রাস্তায় যেতে যেতে যেন কোনো সরাইখানা-টরাইখানায় ঢুকে প'ড়ো না। সরাইখানায় ঢুকলে আমি ঠিক জানতে পারব। সাবধান কিন্তু।'

'না কর্তা, সরাইখানায় আমি কী দরকারে ঢুকব ? এখান থেকে সোজা আমি বাড়িতে হাঁটা দেব।'

হাওয়াসুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভানুমতীর কৌটোর জন্যে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হল।

যেতে যেতে রাস্তায় এক সরাইখানা পড়ল। এক ঢোঁক সরবৎ খেতে বড্ড ইচ্ছে হল তার।

'ঢোকা তো যাক, তারপর যা হবার হবে। হাওয়াসুর হয়তো টেরই পাবে না।' এই ভেবে সে দুর্গা বলে সরাইখানায় ঢুকে পড়ল।

সরাইখানার মালিক এসে জিজ্ঞেস করল: 'মশাই, কী চাই ?'

'আমার কিচ্ছু চাই না।'

'তবে রে হতভাগা, কিছু চাস না তো ঢুকেছিস কেন ?'

'কি, আমাকে হতভাগা বলা ? দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।' রাগে সে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর সে মন্তর পড়তে লাগল :

'ভানুমতীর কৌটো, ভাই।
পাই যদি ক্ষীরপোলাও খাই॥'

বলতে না বলতে তার সামনে থালাভর্তি রাজ্যের মিঠাইমণ্ডা এসে হাজির।

দেখে তো সরাইখানার মালিক আর মালিক-বউয়ের চক্ষের পাতা পড়ে না। তারা প্রশ্ন করে :

'এমন কৌটো কোথায় পেলেন, মশাই ? বাপের জন্মেও তো এমন আশ্চর্য কৌটো দেখি নি।'

মালিক আর মালিক-বউকে ডেকে সে তৃপ্তি করে খাওয়ায়।

মালিকের ইশারায় মালিক-বউ চাষীকে একভাঁড় কড়া মদ এনে দেয়। খেয়ে সে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে।

সরাইখানার মালিক সেই অবসরে ভানুমতীর কৌটোটা সরিয়ে সেই জায়গায় অন্য একটা কৌটো ঝুলিয়ে রাখল। তারপর সকাল হলে ঘুমন্ত চাষীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগল :

'বেলা হয়ে গেছে, উঠে পড়ুন।'

লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। দেয়ালের গা থেকে কৌটোটা পেড়ে নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে সে বাড়ির পথে রওনা হল।

বাড়ির দরজায় বউয়ের সঙ্গে দেখা। বউ মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল : 'কিগো, মাঠে হাওয়ার দেখা পেলে?'

চাষী একমুখ হেসে জবাব দিল : 'পেলাম।' তারপর সেই কৌটোটা দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে মন্তর বলল

'ভানুমতীর কৌটো, ভাই।
পাই যদি, ক্ষীরপোলাও খাই।'

কিন্তু মন্তরে কাজ হল না। না এল ক্ষীর, না এল পোলাও — থালাভর্তি খাবার তো দূরের কথা। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কৌটোটা নামিয়ে দেয়ালের গায়ে সে আছাড় মারতে লাগল। কৌটো তো ভাঙলই, মারের চোটে দেয়ালও কাত হয়ে পড়ল। পরে রাগ পড়ে গেলে আবার সে হাওয়াসুরের সন্ধানে ছুটল।

মুরগীর-ঠ্যাঙে-ভর-দেওয়া ঘরে ফিরে গেলে হাওয়াসুর তাকে বলল : কী চাষী, কী মনে করে? তোমাকে ভানুমতীর কৌটো তো দিয়েছি — আবার কী দরকারে?'

'ভানুমতীর কৌটো নিয়েই ঝকমারি করেছি। ওতে আমার হবার মধ্যে শুধু লোকসানই হল।'

'লোকসান কী রকম?'

'নয় তো কি! কৌটোর কাছে চাইলাম ক্ষীরপোলাও, কৌটো নড়লও না, চড়লও না। কৌটোকে ধরে আছাড় দিলাম, মাঝের থেকে

ঘরের দেয়ালটাই পড়ল ভেঙে। বলুন তো এখন পোড়ো ঘরে আমি বাস করি কী করে? আমায় ওর বদলে আর কিছু দিন।'

হাওয়াসুর তাকে বলল: 'ওহে চাষী, বোকারা না গাছে ফলে, না মাটিতে গজায়! বোকারা মানুষের পেটেই জন্মায়। কেমন, বাড়ি ফেরার সময়ে সরাইখানায় ঢুকেছিলে তো?'

'মোটেই না, কক্ষনো ঢুকি নি।'

হাওয়াসুর রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বললেন: 'মিথ্যে কথা!'

'তা আমার ওপর অত মেজাজ করছেন কেন? আপনার কৌটো থেকে আমার ক্ষিধেতেষ্টা মিটলে আর আপনার কাছে আসতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'আচ্ছা, বেশ কথা। এই ভেড়ার বাচ্চাটা তোমাকে দিচ্ছি। যখনই তোমার টাকার টান পড়বে, তখনই এই ভেড়াটার কাছে এসে মন্তর বলবে—

"আড়া রে মোড়া রে।
ভেড়ার বাচ্চা গা নাড়ে॥"

'ভেড়া তখন গা নাড়লেই ঝনাত ঝনাত করে টাকা পড়বে। সাবধান, সরাইখানায় যেন ঢুকো না। ঢুকলে কিন্তু আমি ঠিক জানতে পারব। খবর্দার, এরপর আবার যদি তোমাকে এখানে আসতে দেখি তাহলে তোমার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে ছাড়ব।'

চাষী মহাখুশি। বুড়ো হাওয়াসুরকে গড় হয়ে প্রণাম করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

সরাইখানার কাছাকাছি আসতেই অমনি নেশা চাপল —'যাই সরাইখানায় ঢুকি।' পা-দুটো তার আপনা-আপনিই টেনে নিয়ে গেল।

সরাইখানার মালিক হাঁ-হাঁ করে চাষীর দিকে ছুটে এল, 'আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক তো তুমি বাপু! বলা নেই কওয়া নেই ভেড়া নিয়ে সটান ঘরে ঢুকছ। ওটাকে বাইরের ঘরে রেখে আসতে পারলে না?'

'তা তুমি অত কথা শোনাচ্ছ কেন ? এ তুমি যে-সে ভেড়া পাও নি — এ ভেড়া জাদু জানে।' তারপর যেই না বলা —

'আড়া রে মোড়া রে।
ভেড়ার বাচ্চা গা নাড়ে ॥'

আর অমনি ঝনাত ঝনাত করে সোনার মোহর, রুপোর টাকা মেঝেয় পড়ে। দেখে তো মালিক আর মালিক-বউয়ের চক্ষের পলক পড়ে না। তারা নিচু হয়ে সোনায় রুপোয় কোঁচড় ভর্তি করে।

সরাইখানার মালিক বলে, 'এ আবার কোন্‌দেশি ভেড়া! বাপের জন্মেও তো এমন দেখি নি! আপনার হাত ধরছি, পা ধরছি — এটা আমাদের বিক্রি করে যান!'

'উঁহুঁ, এ ভেড়া বিক্রির নয়। নাও, এখন টাকা নিয়ে আমায় খাবারদাবার কী আছে দাও।'

মালিক আর মালিক-বউ অমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটল।

লোকটাকে তারা ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসিয়ে চর্ব্যচূষ্য করে খাওয়ায়। তারপর একপেট কড়া মদ খাইয়ে পালকের নরম বিছানায় শুতে দেয়। সে যখন নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই ফাঁকে সরাইখানার ধূর্ত মালিক ভেড়ার বাচ্চাটা বদ্‌লে নেয়।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে মালিক আর মালিক-বউকে 'এখন আসি' বলে চাষী বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বাড়িতে এসে দরজায় ডাকতেই চাষীর বউ এসে দরজা খুলে দেয়। ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে সটান ঘরে ঢোকে।

বউ তো রেগে আগুন। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলে : 'আ মরণ! ভেড়ার বাচ্চাকে আবার ঘরে ঢোকানো কেন? বলি, এটা ঘর না গোয়াল?'

'মেলা চেঁচিও না বলে দিচ্ছি, বউ। এবার থেকে সংসারে আমাদের আর অভাব থাকবে না। ছেলেমেয়েদের আর খাওয়াবার ভাবনা ভাবতে হবে না।'

'বুঝলাম — কিন্তু ভেড়া আমার কী কম্মে লাগবে ? কথায় বলে, পেট জ্বলে ভাতে, সোনার আংটি হাতে। আপনি ঠাকুর ভাত পায় না শঙ্করাকে ডাকে।'

চাষী চটে যায়। বলে, 'থামো, খুব হয়েছে।' তারপর মাটিতে পা ঠুকে মন্তর আওড়ায় :

'আড়া রে মোড়া রে।
ভেড়ার বাচ্চা গা নাড়ে॥'

কিন্তু কোথায় মোহর, কোথায় কী ! এদিক ওদিক পিটপিট করে তাকিয়ে ভেড়া আস্তে লেজ নাড়ায়।

চাষী রাগে ফেটে পড়ে। মাটি থেকে একটা চেলা কাঠ উঠিয়ে ভেড়াটার মাথা সই করে মারে। ম্যাঁ-ম্যাঁ করতে করতে ভেড়াটা মাটিতে আছড়ে পড়ে মরে যায়।

চাষী আবার হাওয়াসুরের কাছে যায় — এইবার নিয়ে তিনবার। বলে : 'আমার সঙ্গে আর কতদিন এভাবে তামাসা করবেন ?'

বুড়োর স্বর পঞ্চমে ওঠে : 'কী রকম ? তোমার সঙ্গে তামাসা করছি আমি ? তোমাকে আমি ভানুমতীর কৌটো দিলাম, ভেড়ার বাচ্চা দিলাম। সে সব তুমি রাখতে পারলে না কেন ? কেন তুমি মরতে সরাইখানায় গিয়েছিলে ?'

'সরাইখানার কথা কী বলছেন ? আপনি যে কৌটো আর ভেড়া দিলেন, তাতে আমার হবার মধ্যে তো শুধু লোকসানই হল। অন্য একটা কিছু দিন।'

হাওয়াসুর গর্জন করে উঠল : 'অন্য কিছু চাই ? দাঁড়াও, এক্ষুনি পাবে। জালা থেকে একবার বেরিয়ে এসো তো হে বাছাধনেরা। মাতালটাকে একবার উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে দাও তো হে ! লুকিয়ে লুকিয়ে নেশা করা, বারণ করলে না শোনা — একবারটি তার ফল বুঝুক।'

দেখতে না দেখতে যণ্ডামার্কা বারোজন পালোয়ান এসে হাজির।

বারো-দুগুণে চব্বিশটা ঘুসি বাগিয়ে তারা চাষী বেচারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মার খেয়ে লোকটা হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে থাকে : 'দাঠাকুর! আপনার দয়ার শরীর — মাপ করুন। প্রাণে মারবেন না, আমাকে ছেড়ে দিন। আর আমি কক্ষনো আসব না ; সবাইকে বলে দেব, কেউ যেন না আসে।'

হাওয়াসুর আদেশ দেয় : 'যাও বাছাধনেরা, জালায় গিয়ে বোসো।' অমনি দেখতে দেখতে বারো জন ষণ্ডা নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

'নাও, এই জালাটা নিয়ে এবার সরাইখানায় যাও। সরাইখানার মালিককে বলবে, আমার ভানুমতীর কৌটো আর ভেড়ার বাচ্চা ফিরিয়ে দাও। না দিতে চাইলে জালা থেকে বাছাধনদের বেরিয়ে আসতে বলবে।'

হাওয়াসুরকে গড় হয়ে প্রণাম করে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চাষী সেই সরাইখানায় ফিরে গেল। দরজার কড়া নাড়তেই মালিক বেরিয়ে এল। এসে দেখে সেই চাষীটা এসেছে। সঙ্গে তার জালা ছাড়া কিছু নেই দেখে সে মুখ নাড়া দিয়ে বলল : 'মদ-টদ এখানে হবে না, ভাগো।'

'আগে তো আমার ভানুমতীর কৌটো আর ভেড়ার বাচ্চা দাও। তারপর যাব।'

'আমরা তোমার কৌটোও নিই নি, ভেড়ার বাচ্চাও নিই নি। তুমি তো দেখলাম যাবার সময় দিব্যি বাড়ি নিয়ে গেলে।'

'সে তো তোমাদেরই বদলে-দেওয়া নকল কৌটো, নকল ভেড়া।'

'মোটেই আমরা কৌটো বদলাই নি, ভেড়াও বদলাই নি। ভালো চাও তো এখনই মানে মানে সরে পড়ো।' এই কথা ব'লে মালিক আর মালিক-বউ চাষীকে সরাইখানা থেকে ঠেলে বার করে দিতে থাকে।

চাষী তখন রেগে খুন হয়ে হাঁক ছাড়ে: 'জালা থেকে একবার বেরিয়ে এসো তো বাছাধনেরা!'

বলতে না বলতে বারোজন ষণ্ডমার্কা জোয়ান জালা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে বারো-দু-গুণে চব্বিশটা ঘুসি বাগিয়ে মালিক আর মালিক-বউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরাইখানার মালিক দেখল সে ভারি বেকায়দায় পড়েছে।

'চাষী ভাই, চাষী ভাই! তোমার দয়ার শরীর। আমি তোমার সব ফিরিয়ে দেব, তুমি শুধু আমাদের প্রাণে বাঁচাও।'

'যাও বাছাধনেরা, জালায় গিয়ে বোসো।' চাষীর হুকুমে চক্ষের নিমেষে বারোজন জোয়ান জালার মধ্যে উধাও হয়ে গেল। বুকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মালিক আর মালিক-বউ চাষীকে তার ভানুমতীর কৌটো আর ভেড়ার বাচ্চাটা ফিরিয়ে দিল।

ভানুমতীর কৌটো আর ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে চাষী মনের সুখে ঘরে ফিরল।

রাজপুত্র কিলা

তেঁতুলগাছের পাতা গুনলে যত হয়, ঠিক তত বছর আগের কথা। হাওয়াই দ্বীপের এক রাজা ছিলেন ওলোপনা। তাঁর রাজ্যের নাম ওয়াইপিও। ওলোপনার একরত্তি মেয়ে লুইউকিয়া — তার রূপের কাছে সাতরঙা রামধনুও হার মানে।

মেয়েকে নিয়ে ওলোপনা বেরিয়েছেন একদিন সমুদ্রে নৌবিহারে। এমন সময় কোথাও কিছু নেই — হঠাৎ উঠল সাঁই-সাঁই ঝড়। পাল-ছেঁড়া নৌকো গিয়ে পড়ল মাঝ-দরিয়ার অথৈ জলে। তারপর দিন যায়, রাত যায় — না থামে তুফান, না থামে নাও। রাজা আর রাজ-কন্যা কী আর করেন — খিদে পেলে কাঁচা কাঁচা উড়ুক্কু মাছ খান আর বৃষ্টির জলে তেষ্টা মেটান। এইভাবে যে-তে যে-তে যে-তে একদিন দক্ষিণ দেশের এক ঘাটে এসে নৌকো লাগে। দেশের নাম টাহিটি।

টাহিটির রাজা মৈহেকা। ও-ও পাতায় ছাওয়া আকাশছোঁয়া বিরাট তাঁর প্রাসাদ। পাখির হাড়ে তৈরি জানলা-দরজার পাল্লা। দেয়ালের গায়ে ভুরভুর করে কাউলিয়া কাঠের মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। তবু মৈহেকার মন উড়ু-উড়ু। দেশ-বেড়ানোর নেশা তাঁর রক্তে। তাই

ওলোপনার মতো একজন রাজাকে পেয়ে মৈহেকা তো ভারি খুশি! ওলোপনার হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিয়ে সেই রাত্তিরেই মৈহেকা সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। যাবার সময় মৈহেকা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বলে গেলেন, 'আমার মৃত্যুর পর যতদিন আমার অস্থি বাপদাদার কবরের পাশে সমাধিস্থ না হয়, ততদিন যেন রাজপ্রাসাদে কোনো জনপ্রাণী প্রবেশ না করে।' মৈহেকার সঙ্গে গেলেন তাঁর ছেলেরা আর তাঁর জনকয়েক প্রিয়পাত্র।

ওলোপনা তো টাহিটির রাজা হলেন।

এদিকে মৈহেকার এক ভারি শয়তান সামন্ত ছিল — নাম তার মুয়া। সে এমন এক চক্রান্ত করল যে, ওলোপনা প্রাণ নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। রাতের অন্ধকারে ঘাটে নৌকো তৈরি। ওলোপনার সঙ্গে যাবে টাহিটির বারোজন বীর —শয়তান মুয়ার অধীনে থাকতে তারাও রাজী নয়।

কিন্তু রাজকন্যা লুইউকিয়া কোথায়? মৈহেকা হন্তদন্ত হয়ে ছোটেন প্রাসাদের দিকে। রাজপ্রাসাদের সিংদরোজার ফাঁকে লুইউ-কিয়ার ছেঁড়া আঁচলের একটা টুকরো দেখা যায়। মেয়ের খোঁজে ওলোপনা ভেতরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় একটা অদৃশ্য দেয়াল তাঁর সামনে এসে রুখে দাঁড়াল। বার বার ডেকেও লুইউকিয়ার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ওলোপনা ভাবলেন, 'এ নিশ্চয় শয়তান মুয়ার জাদু। আমার মেয়েকে আটকে রেখে মুয়া আমাকে শূলে চড়াতে চায়।'

অতটুকু ছোট্ট মেয়েকে মুয়া নিশ্চয় কষ্ট দেবে না — এই ভেবে টাহিটিতে লুইউকিয়াকে ফেলে রেখেই ওলোপনা ক্ষুণ্ণ মনে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। নিরুদ্দেশ রাজাকে আবার ফিরে পেয়ে ওয়াইপিও রাজ্যের প্রজাদের আনন্দ ধরে না।

কিন্তু অদৃশ্য দেয়াল তোলার ব্যাপারে মুয়ার সত্যিই কোনো হাত ছিল না। আসলে ওটা রাজা মৈহেকার জাদু। মৈহেকা খুব ভালো

মন্ত্রবিদ্যা জানতেন। সমুদ্রে যেতে যেতে তাঁর মনে হল, লোকে যদি বারণ ভুলে গিয়ে রাজপ্রাসাদ অশুচি করে ফেলে ? তাই সেই অবস্থাতেই মৈহেকা এমন এক জাদু করলেন যাতে আর কোনো জ্যান্ত প্রাণী রাজবাড়িতে ঢুকতে কিংবা বেরোতে না পারে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদে যে যেখানে ছিল পাষাণ হয়ে গেল। দরজায় দরজায় যে সব প্রহরী মোতায়েন ছিল, ও-ও পাতার চালের ওপর বসে যেসব পাখি রোদ্দুর পোয়াচ্ছিল — নিমেষে পাথরের মূর্তির মতো তারা স্থির হয়ে বসে রইল — চোখের একটা পাতাও আর নড়ল না। লুইউকিয়া ঠিক সেই সময় রাজবাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল, দরজার পাশে ফরাসের ওপর তার অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ল।

ঘুরতে ঘুরতে মৈহেকা এসে পৌঁছুলেন কাইউক দ্বীপে। ধনধান্যে ভরা সেই দেশ। সে-দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে পরে মৈহেকা রাজা হলেন। তাঁর এক ছেলে হল। তার নাম কিলা।

কিলাকে যে দেখে সেই বলে — ছেলে তো নয়, স্বর্গের পারিজাত। কিলাকেই তার বাবা সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিলা বড় হয়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, কাজে কর্মে, সাহসে শক্তিতে কিলা আর সব ভাইকে ছাড়িয়ে যায়। মৈহেকা নিজে কিলাকে জ্যোতিঃশাস্ত্র, জাদুবিদ্যা আর স্বপ্নতত্ত্ব শেখান।

মৈহেকা একদিন মারা যান। রাজদণ্ড হাতে নেন বিধবা রানী।

মৈহেকার আদেশ — তাঁর অস্থি নিয়ে যেতে হবে টাহিটিতে। তাই ঘটের মধ্যে তুলে রাখা হয় মৃত মৈহেকার অস্থি।

বড় ভাইরা এদিকে কিলাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'মা চোখ বুঁজলে তো ছোট ভাই কিলাই রাজা হবে। তার চেয়ে এখুনি ওকে কায়দা করে সরিয়ে ফেলা যাক।' ঠিক হল মৈহেকার অস্থি টাহিটিতে নিয়ে যাবার সময় মাকে তারা বলবে, 'মা, আমরা সব ভাই একসঙ্গে টাহিটিতে যাবো।' তার-পর রাস্তায় কিলাকে যমের বাড়ি পাঠাতে কতক্ষণ ?

মাকে যখন বলা হল, তিনি বললেন, 'ছোট ভাইকে তোরা যখন দেখতেই পারিস নে, তখন ওকে সঙ্গে নিয়ে কী করবি?' ছেলেরা বলল, 'বাবার সব ছেলেই যাচ্ছে, আর একটি যদি না যায়, মা—লোকে বলবে কী?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানী রাজী না হয়ে পারলেন না।

দিনক্ষণ দেখে বাবার অস্থি নিয়ে ছেলেরা টাহিটি যাত্রা করল। যে-তে যে-তে যে-তে একদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ের ওপর থেকে মেঘের ছায়া যখন মিলিয়ে গেল, মাথার ওপর আকাশ হল যখন অগ্নিবর্ণ—নৌকো তখন ওয়াইপিও রাজ্যের তীর ঘেঁষে চলেছে। শয়তান ভাইরা ফিস্‌ফিস্‌ করে নিজেদের মধ্যে যুক্তি আঁটে। একজন বলে, ওকে প্রাণে না মেরে বরং এখানে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফেলে রেখে যাওয়া যাক। বাড়ি ফিরে বললেই হবে: 'দারুণ তুফানে বেচারা নৌকো উল্‌টে একটা হাঙরের পেটে গিয়ে পড়ে।' কথাটায় সবাই সায় দেয়। বড় ভাই তখন হাঁক দিয়ে বলে, 'আজকের রাত্তিরটা এখানকার সাদা বালির ডাঙাতেই কাটানো যাক।'

নৌকো ঘাটে বেঁধে বালির ওপর সবাই শুয়ে পড়ে। একটু পরে যখন কিলা ঘুমিয়েছে, তখন বড় ভাইরা আস্তে আস্তে উঠে কাছের একটা গ্রামে ঢুকে কিলার মতো দেখতে একটি ছেলেকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। তারপর তাকে মেরে তার হাত দুটো কেটে কিলাকে একা ফেলে রেখে নৌকোর নোঙর খুলে দিয়ে নিজেরা বাড়িমুখো রওনা হয়।

বার কয়েক সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে হেলবার পর তারা কাইউই দ্বীপে এসে পৌঁছোয়। বাড়িতে ঢোকার আগে তারা নিজেদের মাথার চুলগুলো মুড়িয়ে নেয়। তারপর বাপের অস্থি নিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ঢোকে। কিলার মা ছুটে আসেন, কিলাকে না দেখতে পেয়ে কেঁদে মাটিতে আছড়ে পড়েন। ছেলেরা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে বলে, 'দারুণ তুফানে নৌকো থেকে কিলা ছিটকে গিয়ে এক হাঙরের মুখে পড়ে।' প্রমাণ হিসেবে তারা দুটো কাটা হাত দেখায়।

কিলার মা তো কেঁদে ভাসান। রাজ্যের লোক কিলার জন্যে হায় হায় করে।

কিলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখে ঘাটে নৌকো নেই। ওয়াইপিও রাজ্যে ভাইরা তাকে একা রেখে পালিয়েছে, মনের দুঃখে কিলা না কেঁদে পারে না।

এদিকে কিলার বড় ভাইরা যে-গাঁয়ের ছেলেটার হাত কেটে নিয়েছিল, সেই গাঁয়ের লোকে সকালে উঠে তার লাশ দেখতে পায়। দল বেঁধে তারা পায়ের দাগ দেখে হত্যাকারীদের খোঁজে বেরিয়ে কিলাকে এসে পাকড়াও করে। কিলাকে টানতে টানতে তারা মোড়লের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করে।

কিলা বলে, 'রাত্তিরে আমরা কয়েকজন এখানকার তীরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি দলের লোকেরা আমাকে ফেলে পালিয়েছে। এর বেশি সত্যিই আমি কিছু জানি না।'

কিলা যে রাজার ছেলে একথা সে ঘুণাক্ষরেও বলে না।

তখন মোড়ল বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে যখন কোনো সাক্ষী-সাবুদ নেই, তখন আর তোমাকে জ্যান্ত কবর দিই কী করে!' কাজেই অনেক ভেবে-চিন্তে মোড়ল শেষ পর্যন্ত সেপাইশান্ত্রীদের ডেকে বললেন, 'যাও, একে বাজপাখির গারদে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করো।'

চারিদিকে আকাশছোঁয়া উঁচু পাহাড়; মধ্যিখানে অন্ধকার অতলস্পর্শ খাদ; সেখানে একদিন অন্তর রাক্ষুসে বাজপাখি হানা দেয়।

এক বিশেষ ধরনের অপরাধীদের এখানে বন্দী করে রাখা হয়। ঢুকবার বেরোবার একটাই রাস্তা এই বন্দীশালার। সেখানে পাহারা দেয় চল্লিশ-চল্লিশ আশীজন বল্লমধারী সেপাই। সেই গারদখানায় বন্দী করা হল কিলাকে।

কিলাকে দেখে পাথরের আড়াল থেকে অন্ধকারে একটা মানুষের

ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। কিলাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাই, এখানে কতক্ষণ ?'

কিলা জবাব দেয়, 'একটা জঙ্গল তিনবার ঘুরে আসতে যতক্ষণ লাগে, ততক্ষণ আগে এখানে এসেছি।'

লোকটা দুঃখ করে বলে, 'আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী! তোমার কাঁচা বয়েস দেখেই দুখ্যু হচ্ছে।'

এ জায়গায় শাস্তি দেবার পদ্ধতিটা কী কিলা জানতে চায়। লোকটা উঁচুতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—পাহাড়ের চুড়োর ওপর সর্বনেশে বাজপাখিটার বাসা। এখানে সে যখন নামে, তখন তার বিরাট দেহে সূর্যদেব ঢাকা পড়েন, খাদের দুটো দিক স্পর্শ করে তার দুই পাখা। আর তার প্রত্যেক পালকের আগায় শক্ত পাথরের শাণিত ছোরার মতো উদ্যত হয়ে থাকে হিংস্র নখর। পাখার ঝাপটে তার দুরন্ত ঝড় নামে। পাহাড়ের প্রত্যেকটা সুড়ঙ্গে আর গুহায় সে তন্ন-তন্ন করে খোঁজে লুকানো বন্দীদের। তারপর ছোঁ মেরে নখের আগায় দুটো মানুষকে গেঁথে নিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় সে তার নিজের ডেরায় ফিরে যায়। এখানে সবাই জানে, যেখানেই পালাও বাজ-পাখির হাত থেকে কারো রক্ষা নেই।

লোকটা বলে, বিশ দিন ধরে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু বেশি দিন নয়—ধরা পড়তেই হবে। বাজপাখির শিকারে আসার পালা ছিল আজ—দুজনকে গেঁথে নিয়ে গেছে। কিলাকে নিয়ে বাকি আছে তারা ন জন। একদিন অন্তর তার মানুষ শিকারের পালা।

তারপর সেই লোকটার হাঁকডাকে পাহাড়ের লুকানো জায়গা থেকে আরও সাতটা লোক একে একে বেরিয়ে আসে। তারা কিলাকে দেখে তার দুর্ভাগ্যে সমবেদনা জানায়। লোকগুলোর চোখেমুখে মৃত্যুর আতঙ্ক ; ক্ষিধেয় পেটপিঠ এক হয়ে তাদের পা টলছে। সেই

পাথরের রাজ্যে কাঁটাগাছ আর শুকনো বাকল ছাড়া কিছু যে খাবার নেই।

যমের হাত থেকে আসছে কাল তাদের ছুটি। কিলা তাই সবাইকে ডেকে বলে, 'কাল যখন আমরা মরছি না, তখন আজ একটু আরাম করে গড়িয়ে নেওয়া যাক। যা ভাববার পরে ভাবলেই চলবে।' কিলার কথা শুনে সবাই শুয়ে পড়ে।

পরদিন কিলা একটা খালি গুহা বেছে নিয়ে তার সামনে বড় বড় পাথর জড়ো করার কাজে সবাইকে লাগিয়ে দিল। আর সে নিজে ছুঁচোলো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে গাছের ডালের আগায় শক্ত করে বেঁধে টাঙির মতো অস্ত্র তৈরি করে নিল। এই করতে তাদের সারাটা দিন কেটে গেল।

পরদিন তারা সেই গুহার মুখে পাথরগুলোর আড়ালে ওত পেতে বসে রইল। বাজপাখির সেদিন শিকারে আসার পালা।

বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল খোঁড়া আর একজন ট্যারা। তারা কিলাকে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ভাই কিলা, তুমি স্বপ্নের মানে বলতে পারো?' কিলা বলে, 'পারি।' তখন খোঁড়া লোকটা বলে, পাহাড়ী আপেল খাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সে; আর ট্যারা লোকটা দেখেছে, সে যেন এক নেমন্তন্ন-বাড়িতে শুয়োর-কাবাবের সঙ্গে আলু-ভাজা খাচ্ছে। কিলা বুঝতে পারে এ স্বপ্নের মানে—লোক দুটোর দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিলা তাই তাদের বলে, 'এর অর্থ তোমাদের না বলাই ভালো।' এরপর প্রথম-দেখা লোকটা এসে কিলাকে তার স্বপ্নের কথা বলে; সে দেখেছে তাকে ভাঁড়ে করে সরবৎ দেওয়া হয়েছে আর সেই সরবৎ সে ঢকঢক করে খাচ্ছে। কিলা তাকে বলে, 'এ স্বপ্নের অর্থ এই যে, তুমি আবার পৃথিবীর আলোয় প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে।'

এমন সময় সেই বাজপাখির প্রচণ্ড পাখসাটে ঝড়ের গর্জন শোনা গেল। গুহায় গুহায় বিদ্যুৎবেগে নেমে এল তার উদ্যত নখ। কিন্তু সে

কোথাও খুঁজে পেল না মানুষ।

ক্রুদ্ধ চিৎকারে ফেটে পড়ে সেই রাক্ষুসে বাজপাখি। কিলা আর সঙ্গীরা যে গুহায় ছিল, শেষ পর্যন্ত তার দু-চারটে পাথর সরাতেই তার নখের আগায় গেঁথে গেল দুটো মানুষ — একজন খোঁড়া একজন ট্যারা। কিলা আর তার সঙ্গীরা পাথরের টাঙি দিয়ে রাক্ষুসে পাখিটার এক কুড়ি পালক খসিয়ে দিল। সেদিন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শিকার দুটো নিয়ে পাহাড়ের ওপর বাজপাখি তার আস্তানায় ফিরে গেল।

পরদিন আবার যমের হাত থেকে ছুটি।

কিলা আর তার ছ'জন সঙ্গী সারাক্ষণ খেটে আরও মজবুত করে পাথরের পাঁচিল তোলে। পরদিন আবার বাজপাখির হানা দেওয়ার পালা।

বাতাসে যখন তার পাখসাট শোনা গেল, তখন গারদখানায় বন্দীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। গুহার মধ্যে বাজপাখি তার পাখা বাড়ানো মাত্র তার দিকে একসঙ্গে সাতটা হাতের ধারালো টাঙি প্রচণ্ড বেগে ছুটে এল। তার পাখার মোটা হাড় মটমট করে গেল ভেঙে। বাজপাখি ক্রুদ্ধ আক্রোশে তার আর-একটা পাখা এগিয়ে দিল গুহার মুখে ; টাঙির আঘাতে তার চার কুড়ি নখ পালকসুদ্ধ খসে পড়ল। বাজপাখির বিকট আর্তনাদে আকাশ উঠল ভরে। বাজপাখি এবার মরীয়া হয়ে তার বিরাট ঠ্যাং আর চোয়ালসুদ্ধ মুখ সেই গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কিলা তখন তার হাতের টাঙিটা প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে মারল বাজপাখির মাথা সই করে। মাথার খুলি দু ফাঁক হয়ে বাজপাখি সেখানেই আছড়ে পড়ে প্রাণ হারালো।

ডালপাতা কুড়িয়ে তারপর মরা বাজপাখিকে তারা দাহ করতে লাগল। খাদের মুখে গলগলিয়ে উঠল ধোঁয়া। তাই দেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সেপাইশান্ত্রী।

ব্যাপার দেখে তো তাদের চক্ষু চড়কগাছ।

রাজার কাছে গেল খবর। রাজা মন্ত্রীকে ডাকলেন। পারিষদেরা এল ছুটে। ডাক পড়ল গণৎকারদের। রাজ্যময় হুলুস্থূল। অনেক ভেবেচিন্তেও ব্যাপারটার যখন কোনো হদিশ পাওয়া গেল না, তখন সবাই বলল বন্দীদের ডাকা যাক। ওদের মধ্যে নিশ্চয় এমন কেউ আছে, যার অলৌকিক শক্তিবলেই এ-অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

সাতজন বন্দীকে তখনই রাজসভায় হাজির করা হল। কিলা কোনো কথা বলে না। বাকি ছ'জনে আঙুল দিয়ে কিলাকে দেখিয়ে একবাক্যে বলে, 'ওই ভিনদেশী লোকটাই, মহারাজ, আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে।' গারদখানায় প্রথম যে-লোকটার সঙ্গে কিলার দেখা হয়েছিল, সে বলে: 'তা ছাড়া মহারাজ, ও লোকটা স্বপ্নবিদ্যাও জানে।'

সব শুনে-টুনে রাজা ছ'জন বন্দীকে মুক্তি দিলেন। তারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। আর কিলাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলো তো, কোন্ দেশের রাজা তুমি?'

কিলা কিন্তু কিছু ভাঙে না; উত্তরে শুধু বলে, 'এখন ওসব জিজ্ঞেস করবেন না — সময় হলে সব বলব। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমার কপালটা বড়ই মন্দ। আমাকে আপনার পায়ের গোলাম করে রাখুন, এই আমি চাই।'

কিলার কথা শুনে রাজা ওলোপনা ভারি খুশি হলেন। কিলা রাজবাড়িতেই থাকে; তার ওপর পড়েছে কাঠ কাটার আর জল তোলার ভার। তার চালচলনে বনেদী বংশের ছাপ আছে — এটা রাজার চোখ এড়ায় না। কিছুদিন পর রাজা ওলোপনা কিলাকে দিলেন তাঁর প্রধান সামন্তের পদ। এমনি করে কিছুদিন যায়।

একদিন রাজা কিলাকে তাঁর পোষ্যপুত্র করে নিলেন। কিলার নতুন নাম রাখা হল — লেনা।

বছর কয়েক পরের কথা। সেবার কাইউই দ্বীপে দারুণ খরা দেখা

দিল। প্রতিপদ পেরিয়ে চতুর্দশী এল, তবু একফোঁটা বৃষ্টি নেই। গাছের সবুজ পাতাগুলো নিঃশেষে মুড়িয়ে খেল ফড়িঙের পঙ্গপাল। খালবিল শুকনো খটখটে, গাঙের স্রোত গেল থেমে। না খেয়ে প্রজারা মাছির মতো মরতে লাগল।

কিলার মা সে দেশের রানী। কিলার অন্য সব ভাইদের ডেকে কিলার মা বললেন, 'শুনতে পাই ওয়াইপিও নাকি অন্নপূর্ণার দেশ। তোমরা যাও, সেখান থেকে ফসল এনে প্রজাদের বাঁচাও।'

দ্বীপের নাম শুনে ছেলেরা আঁতকে ওঠে। ওই দ্বীপেই তো তারা গাঁয়ের একটি ছেলেকে মেরে কিলাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিল। ভয়ে তারা কিছুতেই আর সে দেশে যেতে চায় না। বাজে ওজর দেখিয়ে তারা মাকে বলল, 'কী হবে ওদেশে গিয়ে? ফসল ঘরে ভানছে ওদের। আমরা বাপু, ভিখিরির মতো গিয়ে ওদের কাছে হাত পাততে পারব না।'

কিন্তু অন্নের হাহাকার শিগগিরই এমন মারমূর্তি হয়ে দেখা দিল যে রাজত্ব বাঁচানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত বড় ভাইকে ওয়াইপিও দ্বীপে যেতেই হল।

ওয়াইপিওর ঘাটে ফসল নিতে আসে দেশদেশান্তরের নৌকো। রাজা ওলোপনা কিলাকে দেন ফসল বিলির ভার।

কিলার বড় ভাই কিলার দ্বারস্থ হয়। এদিকে কিলার চেহারা এতই বদলে গেছে যে, তাকে চেনা শক্ত। তবু কিলাকে দেখে বড় ভাইয়ের কেন যেন বুক দুরদুর করে। এক অমাত্য এসে তার কাছে কিলার পরিচয় দেয়: 'ইনিই হচ্ছেন রাজার ছেলে লেনা। এঁর কাছে আপনার প্রার্থনা জানান।'

বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিলা ভাবে, 'মুখ দেখে মনেই হয় না, লোকটার অন্তর এত ছোট। আগে ও নিজের দোষ স্বীকার করুক, তবে ওকে ক্ষমা করব।'

একজন শান্ত্রীকে ডেকে লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলে

দিল কিলা।

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, ‘তোমার বাপের নাম কী?’ লোকটা মনগড়া একটা জবাব দিল। ‘আগে এ দ্বীপে এসেছ কখনও?’ লোকটা বলল, ‘না। এই প্রথম।’

শুনে কিলা তো রেগে আগুন। তক্ষুনি বেআদপ লোকটার নৌকো আটকে রেখে তাকে বন্দী করার হুকুম হল।

এদিকে বড় ছেলের ফিরতে দেরি দেখে কিলার মা চিন্তিত হয়ে অন্য ছেলেদের ডেকে ওয়াইপিও দ্বীপে পাঠালেন। তাদেরও বড় ভাইয়ের হাল হল।

কিলার মা তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজে ওয়াইপিও রওনা হলেন। এদিকে কিলা আগে থেকেই চর পাঠিয়ে খবর নিয়েছিল তার মা কবে আসছেন। মার জন্যে কিলা একটা ঘাসে-ছাওয়া চমৎকার ঘর তৈরি করে রেখেছিল। কিলা আগে থেকে বলে-কয়ে রেখেছিল। ঘাটে এসে নৌকো লাগতেই কাইউই দ্বীপের রানীকে খাতির করে সেই ঘরে তোলা হল। তাঁকে বলা হল, ‘রাজপুত্র লেনা এখুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।’

কিলা যখন আপাদমস্তক দামী পোশাকে ঢেকে মাথায় মুকুট পরে সামনে এসে দাঁড়াল, তার মা গোড়ায় তাকে চিনতেই পারলেন না। কিলাও নিজের আসল পরিচয় গোপন করে বলল, ‘আপনি যাদের খোঁজে এসেছেন, তারা ছাড়া আপনার আর কি কোনো ছেলে নেই?’

কাইউই দ্বীপের রানী বললেন, ‘এরা সব আমার সতীনের ছেলে। আমার নিজের পেটের ছেলে তার বাপের অস্থি নিয়ে টাহিটিতে যাবার সময় সমুদ্রে হাঙরের মুখে মারা পড়ে। এখন আমি নিঃসন্তান।’

কিলা তার মনের ভাব গোপন করে বলে, ‘আপনার সৎ ছেলেদের আমি কিছুতেই বাঁচাতে পারব না। সাত বছর আগে এই

দ্বীপের একটি কচি বয়সের ছেলেকে ওরা খুন করেছিল। বিচারে ওরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।’

এই বলে বন্দী লোকগুলোকে তার সামনে হাজির করার জন্যে কিলা সেপাইদের হুকুম করল। ওরা এলে কিলা তাদের বলল, ‘তোমরা যদি সত্যি কথা বল, তোমাদের আমি মাফ করব। আচ্ছা বলো তো, সাত বছর আগে এই দ্বীপে এসে একটি ছেলেকে মেরে তার হাত কেটে নিয়ে গিয়েছিলে?’

কিলার ভাইরা কিলাকে চিনতে না পেরে ভয়ে কাঁপে। ভাবে, আর রক্ষা নেই। লোকটা নিশ্চয় জাদু জানে; নইলে মনের কথা জানল কী করে?

এবার তার দুটো হাত সামনে মেলে ধরে কিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ‘এই দেখ আমার অক্ষত হাত, আমিই সেই কিলা — যার মৃত্যুর গল্প রটিয়েছিলে তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে। আর তোমাদের সেই নিষ্ঠুর হত্যার দণ্ড দিতে হয়েছে আমাকে। আজ আমার আবার কপাল ফিরেছে, আমি আবার হয়েছি আজ রাজার ছেলে। আর আমার হাতেই আজ তোমাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে।’

কিলা তার মার দিকে ফিরে বলে, ‘মা, তুমি এদের ক্ষমা করতে বলো?’

কিলার মা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে ছিলেন। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে ব্যাপারটা তাঁর কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কিলার প্রশ্ন শুনে তাঁর চমক ভাঙল। বললেন, ‘না বাবা, ওদের পাপের শাস্তি হওয়াই উচিত।’

কিলা কিন্তু তার ভাইদের কোনো কঠোর শাস্তি দিল না। মার সঙ্গে ভাইদের কাইউই দ্বীপে পাঠিয়ে দিল। শুধু তাদের রাজকুমার খেতাব কেড়ে নিয়ে সাধারণ প্রজা হয়ে দেশে বসবাস করতে বলা হল। সম্পত্তির মধ্যে থাকল তাদের শুধু একটা করে নারকেল গাছ। যাবার সময় কিলা তার মার সঙ্গে নানারকমের অঢেল খাবার পাঠিয়ে

দিল — যাতে রাজ্যে বর্ষা পর্যন্ত কোন অন্নকষ্ট না হয়। কিলার মা কিলাকে অনেক করে বললেন তাঁর সঙ্গে যেতে।

কিলা বলল, 'মা, ওলোপনা আমার ধর্মবাপ, এই দেশই এখন আমার স্বদেশ। তবে শিগগির একবার দেশে যাব — বাবার অস্থিটা নিয়ে টাহিটিতে পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে রেখে আসতে হবে।'

রাজা ওলোপনা সব শুনে কিলাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তারপর তাঁর হারানো মেয়ে লুইউকিয়ার কাহিনী বললেন তিনি কিলাকে। চোখের জল মুছতে মুছতে ওলোপনা কিলার হাত ধরে বললেন, 'যদি ওকে খুঁজে পাস, আমার কাছে ফিরিয়ে আনিস। লুইউকিয়াকে ফিরে পাব — জীবনে শুধু এই আশা নিয়েই আমি বেঁচে আছি।'

পায়রার-পালকে-ছাওয়া চল্লিশ-দাঁড়ির এক লাল রঙের নৌকোয় ধ্রুবতারাকে নিশানা করে কাইউই থেকে কিলা যায় ওয়াইপিও রাজ্যে। সঙ্গে তার আশীজন জোয়ান। তারপর দিনক্ষণ দেখে সেখান থেকে মৈহেকার অস্থি বয়ে নিয়ে যায় টাহিটিতে।

টাহিটিতে পা দিতেই হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সে রাজ্যের উপকূল-রক্ষীবাহিনী। বলল, 'কোনো বিদেশীর এই রাজ্যে ঢোকার হুকুম নেই।'

কিলা রেগে গিয়ে জবাব দিল, 'দেখি, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে রাজা মৈহেকার ছেলেকে আটকায়?'

রক্ষীবাহিনীর লোকেরাও চতুর্গুণ চটে উত্তর দেয়, 'রাজার ছেলেটেলে আমরা বুঝি না — আমাদের মুয়ার হুকুম। সে হুকুম না মানলে এখানে মাথা রেখে যেতে হবে।'

কিলা বলে, 'তোমাদের মুয়ার নাম ছেলেবেলায় বাবার মুখে ঢের শুনেছি। তোমাদের মুয়াকে বলো গে যাও, হয় সে নিজে আসুক, নয়তো সে তার দলের সেরা মল্লযোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিক — আমার দলের পুঁচকে পালোয়ান তার মুণ্ডু নিয়ে ভাঁটা খেলবে।'

বলতে না বলতে মুয়ার দলের প্রকাণ্ড দৈত্যাকার এক যোদ্ধা বিরাট এক মুগুর ভাঁজতে ভাঁজতে হঠাৎ এসে হাজির। সঙ্গে তার বর্শা আর লাঠি হাতে দলবল। এসেই সে কিলার দলকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করল।

কিলার দলের সব চেয়ে পুঁচকে লোকটার নাম উকুলিয়াই। মুয়ার দলের সেরা পালোয়ানের সঙ্গে উকুলিয়াই লড়তে চাইল। কিলা তাকে উপদেশ দিয়ে বলল, 'লড়বে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। খবর্দার, ওর মুখের দিকে চেয়ো না — তাহলে ও তোমাকে ঠকিয়ে মুগুর মেরে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে তুমি ওর ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝে নেবে কোন্ দিক থেকে ও তার মুগুর চালাচ্ছে।'
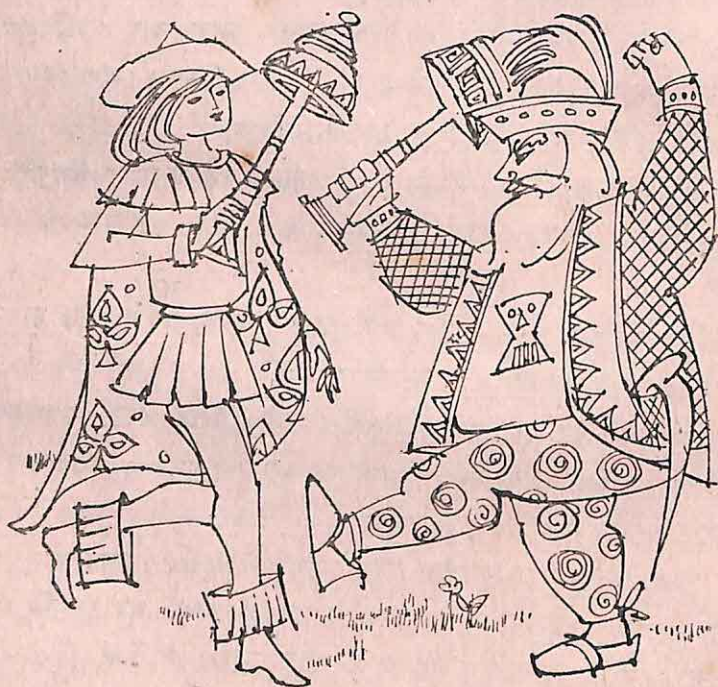
উকুলিয়াইকে দেখে মুয়ার পালোয়ানের তো ভারি ফুর্তি। মাথার ওপর মুগুর ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটে আসে! কিন্তু উকুলিয়াই নড়েও না, চড়েও না—ঠায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুয়ার পালোয়ান তার কাছাকাছি এসে সোজা মাথা সই করে কষে মারল তার মুগুর। এমন সময় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে উকুলিয়াই ডান দিকে একটু পাশ কাটিয়ে মুয়ার পালোয়ানের পিঠের ওপর এমন জোরে ঘা মারল যে, তখনতখনি পাঁজরার হাড় ভেঙে সেখানেই ঘুরে পড়ে লোকটা মারা গেল।

শুনে রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে ছুটে এল মুয়া। এক হাতে তার শড়কি আর এক হাতে বিরাট গদা। এবার কিলা নিজে তার মুখোমুখি হল। সকলে ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে তাদের লড়াই দেখতে লাগল। মুয়ার হাতের শড়কি কিলার গদার এক ঘায়ে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তারপর পরস্পরকে বেড় দিয়ে চলল যুদ্ধ। যেখানে মুয়ার গদা পড়ে, সেখানে বালির ওপর জেগে ওঠে বিশাল গর্ত। এমন সময় কিলার গদা আচম্বিতে এসে লাগে মুয়ার কপালে—বজ্রাহত গাছের মতো মাটিতে উল্‌টে পড়ে মুয়া।

একটা হাঁড়িতে আটবার ভাত রাঁধতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ মুয়া মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল। তারপর যখন জ্ঞান হল, তখন পাহাড়ের দিকে যেদিকে দুচোখ যায় চলে গেল। নিজের রাজ্যে এরপর আর সে লজ্জায় কখনও মুখ দেখায় নি।

তারপর কিলা তার বাবার নিষিদ্ধ প্রাসাদে গেল। বড় বড় আগাছায় দুর্গম হয়ে আছে তার প্রবেশপথ। ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় একটা অদৃশ্য দেয়ালে কিলার গতিরোধ হল। তখন তার মনে পড়ল, তার বাবা মন্ত্রবলে এই দেয়াল তুলে রেখে গেছেন; আর সেই মন্ত্র শিখিয়ে গেছেন কিলাকে। কিলা তখন সেই মন্ত্র উচ্চারণ করল; অমনি সশব্দে খুলে গেল প্রাসাদের রুদ্ধ দুয়ার। সিংদরজার সামনে মোতায়েন দুজন প্রহরী হঠাৎ প্রাণ পেয়ে উঠে

দাঁড়াল। তারা চোখ কচলাতে কচলাতে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?' সামনে কিলাকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'অনেকটা আমাদের পুরনো রাজা মৈহেকার মতো মুখ আপনার। আপনি কে জানতে পারি?' কিলা হেসে উত্তর দেয়, 'আমি তাঁর ছেলে।'

কিলা প্রাসাদের ভেতর ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। সামনেই ফরাসের ওপর এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ঘুম ভেঙে বসে হাই তুলছে। তাকে দেখে কিলার যেন চক্ষের পলক পড়ে না। মেয়েটি কিলাকে তার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া খুলে বলে। তার কথা শুনে কিলা বুঝতে পারে, এই হচ্ছে ওলোপনার সেই হারানো মেয়ে লুইউকিয়া।

রাজা মৈহেকার অস্থি যথাস্থানে সমাহিত করে লুইউকিয়াকে নিয়ে কিলা ওয়াইপিওতে ফিরে আসে। মেয়েকে ফিরে পেয়ে ওলোপনা হাতে স্বর্গ পেলেন। তারপর ধুমধাম করে কিলার সঙ্গে লুইউকিয়ার বিয়ে হল। ওলোপনা মারা গেলে রাজারানী হয়ে কিলা আর লুইউকিয়ার বাকি দিনগুলো সুখেস্বচ্ছন্দে কাটল।

এইখানে ফুরুল বিন্দু বিন্দু সাগরে রামধনু হাওয়াই দ্বীপের গল্প। বড়শির মতো তোমাদের মনে মনে এই গল্পটা গেঁথে রাখো। অন্ধকারে তক্ষক-খেকো ভূত আর প্রজাপতি-ভূত যদি সত্যি হয়, তাহলে জানবে এ গল্পও সত্যি।

হোসেন চাচার নসিব

এক ছিল গরিব কাঠুরিয়া। ছেলে বুড়ো সবাই তাকে ডাকত হোসেন-চাচা বলে। বয়েস তার বছর পঞ্চাশ ; চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু তার জন্যে হোসেন-চাচা কোনোদিন দুঃখ করে নি। রাত না পোয়াতেই হোসেন-চাচাকে ছুটতে হত কাঁধে করাত নিয়ে—পাহাড় জঙ্গলে কোথায় কোন্ কাঠ আছে, তার খোঁজে। তারপর সারাটা দিন এ-জঙ্গল সে-জঙ্গল করে সন্ধ্যে হবো-হবো সময়ে পিঠে একরাশ বোঝা নিয়ে নেমে আসত শহর-বাজারে। রোজ কাঠ বেচে হোসেন-চাচা যা পেত, তাতে বড়ো জোর একবেলা তার নুন-ভাত হত। পেট পুরে খেতে না পেয়ে আর বুড়ো বয়সেও একটু বিশ্রাম না পেয়ে হোসেন-চাচার মনে সুখ ছিল না।

একদিন হোসেন-চাচা বনে গেছে কাঠ কাটতে। কিছুক্ষণ কাঠ কাটার পর হোসেন-চাচার হাঁফ ধরে। দু-দণ্ড জিরিয়ে নেবে ব'লে গিয়ে বসে এক গাছতলায়। এমন সময় হোসেন-চাচা শোনে কাছেই কোথা থেকে কে যেন তাকে অজানা অচেনা গলায় ডাক দিয়ে বলছে—

'হোসেন-চাচা, হোসেন-চাচা—যেতে বলো তো কাছে যাই।'

হোসেন-চাচা কান খাড়া করে শোনে। কিছুতেই ঠাহর করতে পারে না গলাটা কার। বনে যত কাঠুরিয়া আছে, সকলেরই গলার স্বর তার চেনা। কিন্তু এ লোকটা চেনা বলে তো মনে হয় না। তাই হোসেন-চাচার একটু ভয়-ভয় করে। তবু সাহসে ভর করে জবাব দেয়—

'কই ভাই, সামনে এসো তো দেখি!'

গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে সাদা-দাড়িওয়ালা এক খুনখুনে বুড়ো। ভারি সুন্দর মুখশ্রী তার। একগাল হেসে খুনখুনে বুড়োটা হোসেন-চাচার পাশে এসে বসে। তারপর দুজনের আলাপ জমে ওঠে। শুরু হয় যত রাজ্যের কথা। কথায় কথায় বুড়ো লোকটা হোসেন-চাচাকে জিজ্ঞেস করে—

'হোসেন-চাচা, তুমি সুখে আছ কি?'

হোসেন-চাচা একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয়—

'সুখ কোথায়, ভাই? রাত পোয়ালেই রোজ কাঁধে করাত নিয়ে ছুটতে হয় কাঠ কাটতে আর উঁচু পাহাড় থেকে মাথায় মোট নিয়ে নামতে হয় শহর-বাজারে; যা দাম পাই, তাতে ভাতে নুনও জোটে না। পঞ্চাশ বছর বয়েস হল, আর কি বুড়ো হাড়ে এত কষ্ট সহ্য হয়? এমন কপাল যে, জীবনে একটা দিন একটা রাতও শহরে কাটালাম না, বাড়িতে বসে একটা দিনও ছুটি ভোগ করলাম না। খেটে খেটে হদ্দ হলাম কিন্তু পেট পুরে একদিনও খাওয়া জুটল না। এমন জীবনে সুখ কোথায়, ভাই?'

খুনখুনে বুড়োটা মন দিয়ে কাঠুরিয়ার অভাব-অভিযোগের কথা শোনে। তারপর অনেকক্ষণ হোসেন-চাচার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলে—

'তোমাকে আমি উপায় বলে দিচ্ছি। এই রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকো। আল্লা তোমাকে রহম করবেন। যেতে যেতে যদি তোমাকে

রাস্তায় কেউ জিজ্ঞেস করে, "কোথায়? কী মনে করে?" জবাবে তুমি বলবে, "যাচ্ছি বরাতের খোঁজে।" তোমার যা দরকার সব কিছু তুমি মনে মনে চাইতে থাকবে।'

সেই কথা বলবার পর খুনখুনে বুড়োটা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল। হোসেন-চাচা কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবল কী করা যায়। ধরতে গেলে আজ সে কাঠই কাটে নি; কাজেই খুনখুনে বুড়ো যা বলল, একবার পরখ করতে ক্ষতি কি? এই ভেবে করাতটা কাঁধে ফেলে হোসেন-চাচা সিধে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে দিল।

ক্রোশখানেক রাস্তা হাঁটার পর এক নদী। হোসেন-চাচা নদী পার হচ্ছে। এমন সময় এক কোলাব্যাঙকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে বলতে শোনা গেল:

'হোসেন-চাচা, হোসেন-চাচা ! করাত কাঁধে যাও কোথায় ?'

হোসেন-চাচার মনে পড়ে গেল খুনখুনে বুড়োর কথা। ব্যাঙকে তাই হোসেন-চাচা তক্ষুনি জবাব দিল, 'যাই বরাতের খোঁজে।'

কোলাব্যাঙ বলল, 'ও, তবে তো সে রাস্তা আরো এগিয়ে।'

হোসেন-চাচা আবার হাঁটতে থাকে। যে-তে যে-তে যে-তে এক জায়গায় এক শুপুরিগাছের ডগা থেকে এক টুনটুনি পাখি ডাকল —

'হোসেন-চাচা, হোসেন-চাচা — করাত কাঁধে যাও কোথায় ?'

খুনখুনে বুড়োর শেখানো উপদেশ হোসেন-চাচার মনে পড়ল। হোসেন-চাচা উত্তর দিল —

'যাই বরাতের খোঁজে।'

টুনটুনি বলল, 'ও, তবে তো সে রাস্তা আরো এগিয়ে।'

কথা শুনে হোসেন এগোয়। কিন্তু পথ আর ফুরুতেই চায় না।

এমন সময় সূয্যিদেব পাটে বসল, নেমে এল ঘুটঘুটে রাত্তির। সকালে উঠেই হোসেন-চাচা আবার শুরু করে দেয় হাঁটতে। হাঁটতে হাঁটতে আবার সন্ধ্যে হয়। কিন্তু হোসেন-চাচা সিধে রাস্তা কিছুতেই ছাড়ে না। শেষকালে তিন দিন তিন রাত্তির হাঁটার পর হোসেন-চাচা দেখতে পায় রাস্তা গিয়ে ঠেকেছে এক রাজবাড়ির সিংদরজায়। তার দুপাশে দুই সিংহ আছে পাহারায়।

তারা জিজ্ঞেস করল, 'হোসেন-চাচা, হোসেন-চাচা — করাত কাঁধে যাও কোথায় ?'

হোসেন-চাচা আগের মতোই জবাব দেয়, 'যাই বরাতের খোঁজে।'

এবার কিন্তু সিংহেরা অন্যদের মতো বলে না, 'ও, তবে তো সে আরো এগিয়ে' — বরং বলে :

'এখানেই তোমার বরাত খুঁজে পাবে। কিন্তু পেয়েই যখন গেছ, তখন নিয়ে আর করবে কী ? যাও, তার চেয়ে বরং এবার

বাড়ি ফিরে যাও।'

হোসেন-চাচা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলল, 'দাঁড়াও, আগে খুঁজে পাই — নেবো না-নেবো তো তার পরে।'

সিংহেরা অগত্যা বলে, 'তুমি যখন শুনবেই না, তখন যাও — রাজবাড়ির ভেতরে গিয়ে এক তুই ক'রে ঘর গুনতে আরম্ভ করো। চল্লিশ নম্বর ঘরেই তোলা আছে তোমার বরাত।'

হোসেন-চাচা ভেতরে যায়। যেতেই পেছন থেকে একটা সিংহ হুম হুম ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে। বলে :

'এই মানুষটা! থাম্ না, অত হনহনিয়ে চলেছিস কেন? কোন্ রাস্তায় যেতে কোন্ রাস্তায় যাবি, শেষটায় হয়তো বরাতই যাবে ফসকে।'

এই ব'লে একটা সিংহ হোসেন-চাচার সঙ্গ নেয়। সিংহের সঙ্গে যেতে যেতে হোসেন-চাচা দেখতে পায় সামনে একটা লম্বা সরু গলি, তার তুপাশে সারি সারি ঘরের দরজা।

ডানদিকের প্রথম ঘরটা সিংহটি খুলে দেখায়। ঘরের মধ্যে সিংহাসনে বসে আছে একটি লোক — তার গায়ে সোনার-জরি-দেওয়া রেশমী রাজপোশাক।

হোসেন চাচা তাকে দেখে সিংহকে জিজ্ঞেস : 'ও কে?'

'এ হচ্ছে তুনিয়ার কোটিপতিদের বরাত।'

দেখে হোসেন-চাচার খুবই হিংসে হয়। তারপর যেতে যেতে তু'নম্বর দরজা খোলে। সেই ঘরে যে লোকটা রেশমী পোশাক প'রে বসে আছে, তার মাথায় হীরের এক মুকুট।

হোসেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

সিংহ উত্তর দেয়, 'ও হচ্ছে তুনিয়ার লাখপতিদের বরাত।'

এমনিভাবে এক কুঠুরি থেকে আরেক কুঠুরিতে তারা এগিয়ে যায়। সিংহ তারপর উনচল্লিশ নম্বর ঘরের দরজা খোলে। ঘরের মধ্যে ছেঁড়া উলিডুলি কাপড় পরে বসে আছে এক হাড়-জিরজিরে

মানুষ। দেখে দুঃখে হোসেন-চাচার প্রাণ ফেটে যায়।

হোসেন-চাচাকে চোখ মুছতে দেখে সিংহটা বলে, 'সবুর ভাই, সবুর; তোমার বরাতও এখুনি দেখতে পাবে। ও লোকটার দুঃখে তোমার প্রাণ এত গলেছে, নিজেরটা আগে দেখো।' এই বলে সে টান দিয়ে চল্লিশ নম্বরের কুঠুরিটা খোলে। সেই ঘরে বসে আছে আরও হতচ্ছাড়া একটা লোক।

সিংহটা তাকে দেখিয়ে বলে 'হোসেন-চাচা, এই হচ্ছে তোমাদের বরাত।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হোসেন-চাচা ঘরটার মধ্যে ঢোকে। কিন্তু সেই দীন-দুঃখী লোকটা হোসেন-চাচার দিকে ফিরেও তাকাল না। হোসেন-চাচার ভারি রাগ হল।

চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় ক'রে হোসেন-চাচা বলল, 'তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি হদ্দ হলাম, আর তুমি একবার আমার দিকে চেয়েও দেখলে না।'

লোকটা এবার হোসেন-চাচার দিকে ফিরে জবাব দিল, 'তাই যদি চাও — সুস্বাগতম্!'

হোসেন-চাচার এবার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কান্না চেপে বলে, 'আর ঢং করতে হবে না। তোমাকে আগে দেখলে কখনো বরাতের খোঁজে বেরোতাম না। তোমার মতো বরাত আমি চাই না।'

চল্লিশ নম্বর কুঠুরির লোকটা হোসেন-চাচার কথা শোনবার পর দুটো হাত এক ক'রে যেই তালির শব্দ করল, অমনি কোত্থেকে একটা কালো কাফ্রি এসে হাজির হল।

তারপর হোসেন-চাচাকে দেখিয়ে সেই লোকটা কালো কাফ্রিটাকে বলল, 'একে নিয়ে গিয়ে বাকি কুঠুরিগুলো দেখাও।'

কালো কাফ্রিটা হোসেন-চাচাকে সঙ্গে নিয়ে একটার পর একটা কুঠুরিগুলো দেখায়। আশী নম্বর ঘরের দৃশ্য দেখে হোসেন-চাচা

ভয়ে আঁতকে ওঠে—ভেতরে ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে আছে একটা লোক, মানুষ তো নয়, চামড়া দিয়ে ঢাকা এক বীভৎস কঙ্কাল। তার চারিদিকে হিসহিস করে ফণা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে সাপ।

ভয়ে কালো কাফ্রিটার হাত চেপে ধরে হোসেন-চাচা অনুরোধ করে, 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

কাফ্রি জবাব দেয়, 'এখনই ফিরবে কি? এখনো বিশটা ঘর বাকি। দেখে যাবে না?'

কিন্তু হোসেন-চাচা বাকি ঘরগুলো আর দেখতে রাজী হল না। চল্লিশ নম্বর ঘরেই তারা আবার ফিরে গেল। চল্লিশ নম্বর ঘরের লোকটা তখন হোসেন-চাচাকে বলল—

'তুমি যদি আমার বদলে অন্য কাউকে চাও তাহলে এক কাজ করো। চোখ বুঁজে এই গলির মধ্যে ঘুরে বেড়াও। তারপর যে বরাত তুমি চাও, সেই ঘরে ঢুকে পড়ো।'

হোসেন-চাচা অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল। বরাত বদলাতে পারলে ভালোই হয়। কিন্তু চোখবন্ধ অবস্থায় এমনও তো হতে পারে যে প্রথম দিককার ঘরে না ঢুকে ভুল ক'রে শেষের দিকের একটা ঘরে সে ঢুকে পড়তে পারে। সেখানে এক্ষুনি যা সে দেখে এসেছে তাতে কথাটা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

হোসেন-চাচা লোকটাকে বলল, 'না, বরাত বদ্‌লে কাজ নেই। তোমাকে পেয়েই আমি খুশি থাকব।'

এই ব'লে হোসেন-চাচা রাজবাড়ি ছেড়ে বনের দিকে রওনা হল।

রাস্তায় আসতে আসতে শুপুরিগাছের মাথা থেকে টুনটুনি পাখি হোসেন-চাচাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—

'হোসেন-চাচা, হোসেন-চাচা—বরাত পেলে খুঁজে?'

হোসেন-চাচা রা কাড়ে না। কিন্তু যতই যায়, পেছন থেকে কে যেন খিলখিল শব্দ ক'রে হাসে! হোসেন-চাচা পেছন ফিরে দেখে টুনটুনি পাখি হাসছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে নদী পড়ে। নদীর পাড়ে বসে ছিল কোলাব্যাঙ।

হোসেন-চাচাকে ফিরতে দেখে কোলাব্যাঙ জিজ্ঞেস করে, 'হোসেন-চাচা, হোসেন-চাচা — বরাত পেলে খুঁজে ?'

হোসেন-চাচা একটাও কথা না বলে সোজা হাঁটতে থাকে। কিন্তু যতই যায়, খিলখিল শব্দ। হোসেন-চাচা পেছন ফিরে দেখে কোলা-ব্যাঙ হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

যে-তে যে-তে যে-তে বনের রাস্তা পাওয়া গেল। হোসেন-চাচা দেখে — সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সাদা-দাড়িওয়ালা সেই থুনথুনে বুড়ো। ভারি সুন্দর মুখশ্রী। হোসেন-চাচা তাকে তার সমস্ত কাহিনী খুলে বলল। বলতে বলতে দেখা গেল, দুঃখে ভারী হয়ে উঠেছে হোসেন-চাচার মুখ, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

'এখন বুঝেছি, সংসারে আমি ছাড়াও দুঃখী লোক আছে' — এই বলে হোসেন-চাচা চুপ করল।

জমিদারের পেয়াদা ও যম

এক পেয়াদা যাচ্ছিল বাড়ি থেকে জমিদারের মহালে। রাস্তায় যমের সঙ্গে দেখা। দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখে রাস্তার ধারে একটা বাচ্চা ছেলে শুয়োর চরাচ্ছে। একটা ধাড়ী শুয়োর কোন্ ফাঁকে পাশের এক আলুর ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল। পেয়াদাকে আসতে দেখে হন্তদন্ত হয়ে ছেলেটা ধাড়ী শুয়োরটাকে তাড়িয়ে আনতে ছুটল। চিৎকার করে বকতে লাগল, 'হারামজাদা শুয়োর, তোকে যমে নিক।'

তার গালাগাল শুনে পেয়াদা যমের গা টেপে। বলে, 'শুনলে তো? তোমাকে শুয়োরটা দিতে চাইছে যেচে, আর তুমি নিচ্ছ না! আমি হলে তো এক্ষুনি নিয়ে নিতাম।'

যম জবাব দেয়, 'ছেলেমানুষের কথায় কান দিও না। ছেলেটার আপন বলতে কেউ নেই। এখন যদি আমি ওর শুয়োরটাকে নিয়ে নিই, ওর মনিব মেরে ওর পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে। ওর হয়ে দুটো কথা বলবারও ওর কেউ নেই। তাছাড়া ছেলেটা যা বলেছে, সত্যিই তো খুব ভেবে বলে নি।'

পেয়াদা চুপ করে গেল। যেতে যেতে তারা দুজনে একটি শিশুর কান্না শুনতে পেল। তার মা ক্ষেত থেকে সর্ষে তুলতে ব্যস্ত — মেয়েটিকে শান্ত করার তার সময় নেই। মেয়েটির মা আর রাগে চুপ করে থাকতে না পেরে এক ধমক দেয়, 'তোকে যমে নিলে বাঁচতাম। সর্ষেগুলো মাটিতে ঝরে যাচ্ছে, তোর বাপ গেছে জমিদারের বাড়িতে বেগার দিতে — আমাকে একা মাঠভর্তি সর্ষে তুলে শেষ করতে হবে ; তার ওপর তুইও শত্রুতা করছিস!'

শুনে পেয়াদা যমের গা টেপে। বলে, 'কি গো, কানে যাচ্ছে ? মেয়েটাকে দিতে চাইছে, তা নিচ্ছ না কেন ? আমি হলে তো এক্ষুনি নিতাম।'

যম জবাব দেয়, 'মার সবে-ধন ঐ একরত্তি মেয়ে! ওকে আমি
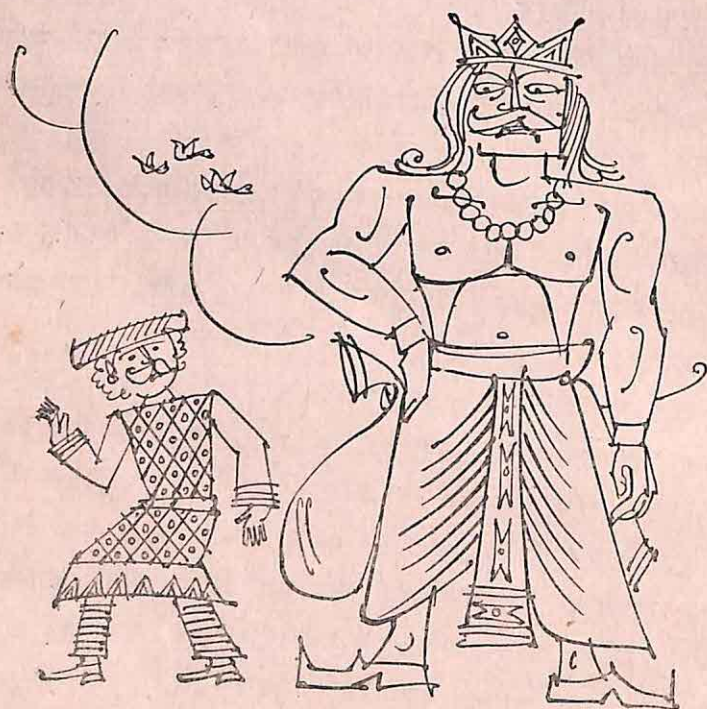
নিতে যাবই বা কেন! তা ছাড়া ওর মা তো আর কথাটা ভেবে বলে নি।'

পেয়াদা আর রা কাড়ে না। দুজনে আবার হাঁটতে থাকে। জমিদারের জমিতে একদল চাষী কাজ করছিল। পেয়াদাকে আসতে দেখে তারা শাপান্ত ক'রে বলে, 'পেয়াদা ব্যাটা এসে আবার হাজির হয়েছে। ব্যাটা শয়তানের একশেষ। লোকটাকে যমে নিলে বাঁচতাম! দেখো এক্ষুনি আবার কার পিঠে লাঠি ভাঙে তার ঠিক নেই।'

শুনে যম পেয়াদাকে বলে, 'কিগো কানে গেল? এবার ওরা কিন্তু প্রাণের কথাই বলেছে। শুনলে তো?'

পেয়াদা চটে গিয়ে বলে, 'বয়ে গেল। ওরা হচ্ছে আকাট চাষা। ওরা না শোনে কথা, না করে কাজ।'

যম বলে, 'সে যাই হোক — ওরা কিন্তু সত্যি কথাই বলেছে। ওরা যা বলেছে তা ওদের মনের কথা। কাজেই তোমার মত লোককেই আমার চাই।'

এই ব'লে তখন তখনই পেয়াদাকে ধরে তার ঘাড় মট্‌কে যম তাকে দলা পাকিয়ে তার চামড়ার ঝোলার মধ্যে পুরে নিল। তারপর পায়ে পায়ে ধুলোর ঝড় তুলে পেয়াদাকে নিয়ে নরকে নিজের রাজ্যে যম ফিরে গেল।

এক ছারপোকা, এক মাছি

এক যে ছিল গরিব লোক। পাহাড়ের ওপর ছোট চালা বেঁধে থাকত। তার ছেঁড়া কাঁথায় বাস করত এক ছারপোকা আর তার লম্বা আল-খাল্লায় থাকত একটা মাছি। মহা স্থখে দিন কাটছিল তাদের। কিন্তু এত স্থখ কপালে সইবে কেন?

হঠাৎ একদিন অস্থখে লোকটা মারা গেল। পাড়াপড়শীরা ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিকে তাকে মাটি দিয়ে এল। বেচারা মাছি আর ছারপোকার আপন বলতে আর কেউ রইল না।

সারাদিন ধরে তারা পা ছড়িয়ে স্থর ক'রে কাঁদে। বিকেলে যখন ক্ষিধেয় নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড়, তখন খুঁজেপেতে দেখে দাঁতে কাটবার কুটোটুকুও নেই; তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, অথচ এক ঢোঁক জল নেই।

বিছানার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো, মেঝের এ-কোণ থেকে ও-কোণ—সারা ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও তারা এক টুকরো খাবার, এক ফোঁটা জল খুঁজে পায় না।

মাছি ছারপোকাকে জিজ্ঞেস করে, 'ছারপোকা ভাই, ছারপোকা

ভাই — এখন উপায় কী ? খিদে-তেষ্টা মেটাই কিসে ?'

ছারপোকা বলে, 'চলো ভাই, দু-দশ দিক দেখে ঘুরে আসি — যদি কোনো গরিব লোক পাই। এমন ক'রে তো না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলে না।'

শুনে তো মাছি আনন্দে তিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি দাদা, লাখ কথার এক কথা বলেছ।'

এই ব'লে তারা গরিব লোকের খোঁজে লম্বা পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়ে।

ছারপোকা তার কুটুর কুটুর ছোট্ট পা ফেলে দৌড়োয় ; ঘাসে ভর দিয়ে মাছি তিড়িং তিড়িং ছোটে। মাছি তো হাঁটতে পারে না, ব্যাঙের মত লাফায়।

মাছি বলে ছারপোকাকে, 'ছারপোকা ভাই, ছারপোকা ভাই — তুমি ততক্ষণ এগোও, আমি বসি। আমি খানিক পরে পা চালিয়ে তোমাকে ধরে নেব'খন।'

ছারপোকা বলে, 'বেশ তো।' ব'লে ঘাস আর কাঁকরের ওপর দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে যায়।

ছারপোকা যখন অনেকটা পথ আগে চলে যায়, তখন মাছি রওনা দেয়। চোখের পলক পড়তে না পড়তে তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে সে ছারপোকাকে ধরে ফেলে।

ছারপোকা আর মাছি এমনি ক'রে এগোতে থাকে। যে-তে যে-তে অনেকদিন পর — ঠিক — কতদিন তা কারো জানা নেই — তারা একটা নদীর ধারে এসে পোঁছোয়।

মাছি ছারপোকাকে ডেকে বলে, 'চলো, নদী পার হওয়া যাক।'

ছারপোকা সায় দিয়ে বলে, 'চলো, পার হই।'

অমনি চক্ষের নিমেষে মাছি তিড়িং ক'রে নদী পার হয়ে যায়।
ওপারে গিয়ে মাছি ছারপোকাকে ডেকে বলে, 'ছারপোকা ভাই,

ছারপোকা ভাই — লাফ দিয়ে এপারে এসো। দেখো, আবার জলে প'ড়ো না।'

কথাটা ছারপোকার আঁতে গিয়ে লাগে। বলে, 'তুমি কি ভাবো নদী আমি পার হতে পারি না? তোমার চেয়ে আমি কম যাই?'

নদীর পাড়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে ছারপোকা একলাফ দেয়। ওপার পর্যন্ত তাকে আর পৌঁছোতে হয় না। ঝপাং ক'রে পড়বি তো পড় একেবারে মাঝগাঙে। ভয়ে তো তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ভাবে, এবার মলাম। ছারপোকা প্রাণের ভয়ে চ্যাচায় — 'ডুবে গেলাম, ও মাছি ভাই! বাঁচাও!'

ছারপোকাকে জলে পড়তে দেখে মাছি ভয়ে দৌড় দেয়। ছারপোকার কাতরানি শুনে আরও জোরে সে ছুটতে থাকে। বন্ধুর বিপদে সাহায্য করার জন্যে প্রাণ যদিও ছুটে যাচ্ছে — কিন্তু কী যে করবে ভেবে পায় না।

মাছি কেঁদে বলে, 'ছারপোকা ভাই, ছারপোকা ভাই — কী ক'রে তোমাকে জল থেকে তুলি?'

'একটা কুঁচির ডগা ফেলে দাও, ধরে উঠবো।'

মাছি বলে, 'কুঁচি পাবো কোথায়?'

জলে হাবুডুবু খেতে খেতে ছারপোকা উত্তর দেয়, 'কুঁচি পাবে বুনো শুয়োরের কাছে। শিগগির যাও, ডুবে মলাম!'

মাছি ছারপোকাকে ডেকে বলে, 'আমি না আসা পর্যন্ত দোহাই তোমার, ডুবো না। বনে গিয়ে বুনো শুয়োরের কাছ থেকে এক্ষুনি আমি কুঁচি নিয়ে আসছি — চোখের পাতা পড়তে যা দেরি।'

তিড়িং তিড়িং ক'রে মাছি এক ঘুরঘুট্টি বনে গিয়ে ঢোকে। ঢুকতেই এক বুনো শুয়োরের সঙ্গে দেখা। মাছি বলে, 'বুনোশুয়োর গো, বুনোশুয়োর — আমায় একটা কুঁচি দাও না, ভাই! ছারপোকা

বন্ধু জলে পড়েছে, টেনে তুলব।'

বুনোশুয়োর বলে, 'ওক-গাছের কাছে যাও। গিয়ে বলো আমাকে যদি সে এক ঝুড়ি ফল দেয়, সেই ফল খেয়ে আমি তোমাকে আমার কুঁচি দিতে পারি। সেই কুঁচি দিয়ে তখন তুমি তোমার বন্ধু বেচারাকে জল থেকে টেনে তুলতে পারবে।'

মাছি তখন তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফিয়ে এক বুড়ো থুরথুরে ওক-গাছের কাছে গিয়ে বলে, 'ওক-গাছ গো, ওক-গাছ — আমাকে কিছু ফল দাও না, বুনো শুয়োরকে দেব। বুনো শুয়োর সেই ফল খেয়ে তক্ষুণি আমাকে তার কুঁচি দেবে। আমি সেই কুঁচি নিয়ে নদীতে ছুটে গিয়ে ছারপোকা বেচারাকে জল থেকে টেনে তুলব।'

বুড়ো ওক-গাছ তার পাতা ঝাঁকিয়ে বলল, 'যাও, কাঠ-ঠোকরাকে গিয়ে বলো, সে যেন আমার গাছের গোড়া না ঠোক-রায়। যদি সে আমার গাছের গোড়া ঠোকরানো বন্ধ করে, তাহলে আমি তোমাকে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল দেব। বুনো শুয়োর সেই ফল খেয়ে তোমাকে তার কুঁচি দেবে। সেই কুঁচি নিয়ে গিয়ে তুমি তোমার ছারপোকা বন্ধুকে জল থেকে টেনে তুলতে পারবে।'

মাছি তখন তিড়িং ক'রে লাফিয়ে কাঠঠোকরার কাছে যায়। বলে, 'কাঠঠোকরা গো, কাঠঠোকরা — ওক-গাছের গোড়া যেন আর ঠুকরিও না। তাহলে ওক-গাছ বুনো শুয়োরকে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল দেবে। সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর আমাকে কুঁচি দেবে। সেই কুঁচি দিয়ে আমি ছারপোকা বেচারাকে জল থেকে টেনে তুলব।'

উত্তরে কাঠঠোকরা মাছিকে বলে, 'বেড়াল এসে রোজ রোজ আমার ছানাগুলোকে খেয়ে যায়। আগে তাকে সামলাও, আমিও তখন আর ওক-গাছের গোড়া ঠোকরাব না। তাহলে ওক-গাছও

বুনো শুয়োরকে ধামা ধামা ফল দেবে। বুনো শুয়োর তাহলে তোমাকে তার কুঁচি দেবে। সেই কুঁচি দিয়ে তুমি তখন তোমার বন্ধুকে জল থেকে তুলবে।'

মাছি ভাবে, 'অগত্যা বেড়ালের কাছেই যেতে হবে।' এই ভেবে তখন বেড়ালের কাছে যায়।

বেড়ালকে ডেকে বলে, 'বেড়াল ভাই, বেড়াল ভাই — তুমি দয়া ক'রে কাঠঠোকরার ছানাগুলোকে খেয়ো না। কাঠঠোকরা ওক-গাছের গোড়া তাহলে ঠোকরাবে না। ওক-গাছও তখন ধামা-ধামা ফল দেবে। সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর তখন আমাকে তার কুঁচি দেবে। সেই কুঁচি দিয়ে বেচারা ছারপোকাকে আমি জল থেকে তুলব।'
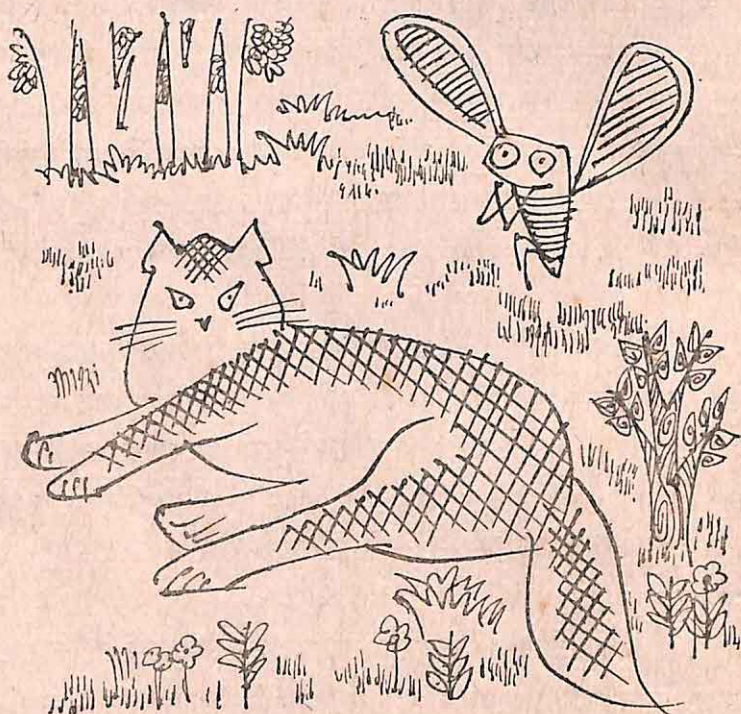
বেড়াল মিউ মিউ ক'রে জবাব দেয়, 'তোমার এই মহৎ কাজে বনের দেবতা নিশ্চয় সহায় হবেন। কিন্তু গরু যতক্ষণ আমাকে দুধ না দিচ্ছে, ততক্ষণ আমি নাচার। আমার জন্যে দুধ এনে দাও; গোঁফের দিব্যি, আমি কাঠঠোকরার একটি ছানাও আর খাব না। তখন কাঠঠোকরাও আর ওক-গাছের গোড়া ঠোকরাবে না। ওক-গাছও বুনো শুয়োরকে রাশি-রাশি ফল দেবে। ফল খেয়ে বুনো শুয়োরও তখন তোমাকে তার কুঁচি দেবে। তারপর বনের দেবতাও নিশ্চয় তোমার সহায় হবেন।'

বেড়ালকে ধরেও কিছু হল না দেখে মাছি তখন তিড়িং তিড়িং ক'রে গাই-গরুর কাছে গিয়ে হাজির হয়।

মাছি বলে, 'গাই-গরু গো, গাই-গরু — বেড়ালকে একটু দুধ দাও না। দুধ পেলে বেড়াল আর কাঠঠোকরার ছানা খাবে না। ছানা না খেলে কাঠঠোকরাও আর ওক-গাছের গোড়া ঠোকরাবে না। গোড়া না ঠোকরালে ওক-গাছ ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল দেবে। সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর আমাকে তার কুঁচি দেবে। সেই কুঁচি দিয়ে আমি ছারপোকা বন্ধুকে নদী থেকে টেনে তুলব।'

গাই-গরু হাম্বা হাম্বা রব ক'রে মাছিকে বলে, 'কাজটা যখন ভাল, তখন নিশ্চয় দুধ দেব। বেড়াল সেই দুধ খেয়ে কাঠঠোকরার ছানাগুলোকে আর খাবে না। কাঠঠোকরা ওক-গাছের গোড়া ঠোকরাবে না। ওক-গাছ ধামা-ধামা ফল দেবে। বুনো শুয়োর সেই ফল খেয়ে তোমাকে কুঁচি দেবে। সেই কুঁচি দিয়ে তুমি ছারপোকাকে জল থেকে টেনে তুলবে। পাহাড়ের দেবতারা তোমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

শুনে মাছি আনন্দে ধেই ধেই ক'রে নাচতে থাকে। বলে, 'ভগবান, তোমার ভাল করুন।'

তারপর গাই-গরুর কাছ থেকে দুধ নিয়ে মাছি বেড়ালের কাছে যায়। বেড়াল সেই দুধ চাঁছিপুঁছি ক'রে খেয়ে জিভ দিয়ে গোঁফ চেটে

নেয়। তারপর গদগদ হয়ে মাছিকে বলে, 'কাঠঠোকরাকে গিয়ে বলো — ধরে খাওয়া দূরে থাক, ওর ছানাদের দিকে আমি ভুলেও তাকাব না।'

মাছি তারপর তিড়িং তিড়িং ক'রে কাঠঠোকরার কাছে যায়। গিয়ে বলে — 'ধরে খাওয়া দূরে থাক, বেড়াল আর তোমার ছানাদের দিকে ভুলেও তাকাবে না।'

কাঠঠোকরা বলে, 'তাহলে আমিও আর ওক-গাছের গোড়া ঠোকরাব না।'

মাছি তখন বুড়ো থুরথুরে ওক-গাছের কাছে যায়। বুড়ো থুরথুরে ওক-গাছ গা নাড়া দেয়, অমনি ঝুপ-ঝুপ ক'রে অজস্র ফল পড়ে। সেই ফল পেয়ে বুনো শুয়োর মাছিকে তার কুঁচি দেয়।

কুঁচি নিয়ে মাছি নদীতে তার বন্ধুর কাছে ছোটে। গিয়ে দেখে তার ছারপোকা বন্ধু ডোবে-ডোবে। দেখে ভয়ে মাছির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তাড়াতাড়ি কুঁচির একটা খুঁট জলে ফেলে দিয়ে ডাকে : 'ছারপোকা ভাই, ছারপোকা ভাই — কুঁচিটা শক্ত ক'রে চেপে ধরো।'

কুঁচি দেখে ছারপোকার ধড়ে প্রাণ আসে। খুদে খুদে পা দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কুঁচিটা চেপে ধরে আর সেই অবস্থায় মাছি তাকে জল থেকে টেনে তোলে।

ঘাসে তার ভিজে গোঁফজোড়া আর বালিতে তার ভিজে ঠ্যাং দুটো মুছে নিয়ে ছারপোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ভগবান তোমাকে চিরসুখী করুন। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

মাছি বলে, 'ধন্যবাদ দিতে হয় তো বুনো শুয়োরকে দাও। সে যদি আমাকে কুঁচি না দিত, তাহলে তোমাকে আর বাঁচতে হত না।'

ছারপোকা মাথা চুলকে বলে, 'কথাটা ঠিকই। চলো, বুনো শুয়োরকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।'

মাছি বলে, 'তিন দিন রাত পেটে কিছু পড়ে নি। ক্ষিধে-তেষ্টায় মারা যাচ্ছি। চলো, আগে কিছু খাবার যোগাড় করা যাক।'

ছারপোকা বলে, 'আগে চলো, বুনো শুয়োরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি। তারপরে ক্ষিধেতেষ্টা মেটালেই হবে।'

টো-টো ক'রে ঘুরে ঘুরে মাছি বেচারার পা টনটন করছে, পেট গিয়ে পিঠের সঙ্গে ঠেকেছে। তবু উপায় নেই। ছারপোকা বন্ধুর সঙ্গে যেতে হয় বুনো শুয়োরের কাছে। যে-তে যে-তে যে-তে শেষ পর্যন্ত বনের রাস্তায় বুনো শুয়োরের সঙ্গে দেখা।

'মাছিকে তুমি কুঁচি দিয়েছিলে! সেই কুঁচি দিয়ে মাছি আমাকে ডাঙায় তুলেছে। আমার বিপদে তুমি সাহায্য করেছ — বনের দেবতা তোমার ভাল করুন।'

বুনো শুয়োর ঘোঁত-ঘোঁত ক'রে বলে, 'ধন্যবাদ দিতে হয় তো ওক-গাছকে দাও। ওক-গাছ আমাকে একরাশ ফল দিয়েছে। সেইফল খেয়েই না আমি মাছিকে কুঁচি দিয়েছি। সেই কুঁচি দিয়ে মাছি তোমাকে ডাঙায় তুলেছে।'

মাছি আর ছারপোকা তখন ওক-গাছের কাছে যায়। 'ওক-গাছ গো, ওক-গাছ — তুমি আমায় জীবন দিয়েছ। বুনো শুয়োরকে তুমি ফল দিয়েছ; সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর মাছিকে তার কুঁচি দিয়েছে। সেই কুঁচি নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মাছি আমাকে ডাঙায় তুলেছে। ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।'

ওক-গাছ তার পাতা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলে, 'ভগবান আমাকে এমনিতেই দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন। তার চেয়ে তুমি কাঠঠোকরাকে ধন্যবাদ দাও, তার দীর্ঘ জীবন কামনা করো। কাঠঠোকরা আমার গোড়া ঠোকরানো বন্ধ করেছে বলেই না আমি বুনো শুয়োরকে ধামা-ধামা ফল দিয়েছি। বুনো শুয়োর সেই ফল খেয়ে মাছিকে তার কুঁচি দিয়েছে। মাছি সেই কুঁচি দিয়ে তোমাকে ডাঙায় তুলেছে।'

মাছি আর ছারপোকা সেখান থেকে যায় কাঠঠোকরার কাছে।

ছারপোকা বলে, 'কাঠঠোকরা গো, কাঠঠোকরা — ওক-গাছের গোড়া ঠোকরানো বন্ধ করেছ বলে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ওক-

গাছ তাই তো অজস্র ফল দিল। আর বুনো শুয়োর তাই খেয়ে তো তার কুঁচি দিল। তাই তো মাছি আমায় ডাঙায় তুলতে পারল।'

কাঠঠোকরা গুনগুন ক'রে বলে, 'ধন্যবাদ দিতে হলে বেড়ালকে দাও। বেড়াল আমার ছানাগুলোকে ধরে ধরে খাওয়া বন্ধ করল বলেই তো আমি ওক-গাছের গোড়া আর ঠোকরাই না। তাই তো ওক-গাছ ফল দিল। সেই ফল খেয়েই তো বুনো শুয়োর মাছিকে তার কুঁচি দিল। সেই কুঁচি দিয়ে মাছি তোমাকে ডাঙায় তুলল।'

ছারপোকা তখন মাছিকে বলে, 'চলো, বেড়ালকে গিয়ে ধরি।'

মাছি বলে, 'না গিয়ে আর উপায় কী ?'

তারপর তারা বেড়ালের কাছে যায়।

বেড়ালকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই ছারপোকা চেঁচিয়ে ওঠে 'বেড়াল ভাই, বেড়াল ভাই — কাঠঠোকরার ছানাগুলোকে তুমি আর, খাচ্ছ না বলে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি। বনের দেবতা তোমার ভালো করুন। কাঠঠোকরাও আর ওক-গাছের গোড়া ঠোকরায় না। ওক-গাছও তাই ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল দিয়েছে। সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর মাছিকে তার কুঁচি দিয়েছে। সেই কুঁচি দিয়েই তো মাছি আমায় ডাঙায় তুলেছে।'

বেড়াল তার সাদা গোঁফজোড়া চুমরিয়ে একটু হাই তুলে তারপর জবাব দেয়, 'একপেট দুধই যখন পেলাম, তখন আর বোকারাম কাঠঠোকরার পুঁচকে ছানাগুলোকে খেতে যাব কোন্ দুঃখে ? গাই-গরু আমাকে দুধ দিল, তাই আমি কাঠঠোকরার বাসার দিকে আর ফিরেও তাকাই নি। কাঠঠোকরাও তাই আর ওক গাছের গোড়া ঠোকরায় না। ওক গাছও তাই বুনো শুয়োরকে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল দিল। সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর মাছিকে তার কুঁচি দিয়েছে। সেই কুঁচি দিয়েই তো মাছি তোমায় ডাঙায় তুলেছে। বরং তুমি গাই-গরুকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসো।'

ছারপোকা বলে, 'তথাস্তু।' বলে গরুর খোঁজে ছোটে।

বালি আর ইটপাথরের ওপর দিয়ে ছারপোকা হনহনিয়ে ছোটে। পেছনে পেছনে ছোটে মাছি। অনেকটা যাবার পর — কতটা তা কেউ জানে না — সামনে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। ঘাসে ঘাসে সবুজ হয়ে আছে। সেখানে গরুকে চরতে দেখা যায়।

মাছি আর ছারপোকা গরুর সামনে এসে দাঁড়ায়। ছারপোকা হাঁটু গেড়ে হাত জোড় ক'রে বলে, 'গরু মশাই, গরু মশাই — দয়ার সাগর আপনি, আপনার দয়াতেই বাঁচলাম। বেড়ালকে আপনি দুধ দিলেন। সেই দুধ চেটেপুটে খেয়ে সে কাঠঠোকরার ছানাগুলোকে খাওয়া বন্ধ করল। কাঠঠোকরাও তাই ওক-গাছের আর গোড়া ঠোকরায় না। ওক-গাছও তাই দুহাতে ফল দিল। সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর ছারপোকাকে তার কুঁচি দিল। সেই কুঁচি দিয়েই তো ছারপোকা আমাকে ডাঙায় তুলল। আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন — পাহাড়, বন আর সমতলের দেবতারা আপনাকে দীর্ঘ জীবন দিন।'

গরু তার গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে হাম্বা হাম্বা সুরে বলল, 'ভাল কাজের জন্যে দুধ দিতে আমি সর্বদাই রাজী। যখন আমি তোমার বিপদের কথা শুনলাম, তখন আমার ভারি দুঃখ হল। তাই বেড়ালকে কিছুটা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। বেড়াল সে দুধ পেট পুরে চাঁছিপুঁছি ক'রে খেল। পেট যখন তার ভরে আইঢাই হল, যখন সে কাঠ-ঠোকরার ছানাগুলোকে খাওয়া ছেড়ে দিল। তাই কাঠঠোকরাও তখন ওক-গাছের গোড়া ঠোকরানো ছেড়ে দিল। ওক-গাছ তাই ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল দিল। পেট ভরে সেই ফল খেয়ে বুনো শুয়োর ছার-পোকাকে তার কুঁচি দিল। সেই কুঁচি দিয়েই তো ছারপোকা তোমাকে ডাঙায় তুলল। যদি রাখাল ছেলে না থাকত, তাহলে আমি কচি-কচি ঘাসও ছিঁড়ে খেতাম না আর বেড়ালও তাহলে দুধ পেত না। ধন্যবাদ যদি দিতেই হয়, তবে সেই রাখাল ছেলেকেই দাও গে।'

ছারপোকা বলল, 'খাঁটি কথা বলেছেন। চলো, মাছি ভাই — রাখাল ছেলের কাছে যাই।'

মাছি বলে, 'চলো যাই।'

মাছি আর ছারপোকা সোজা রাস্তা ধরে রাখাল ছেলের কাছে যায়। দুজনেরই ক্ষিধেয় নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড়—তাই আর ত্বর সয় না। তারা সোজা রাখাল ছেলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। একটা ছোট্ট ভাঙা কুঁড়ের সামনে গিয়ে তারা দেখে একটা গরিব পাহাড়ী ছেলে ঘোঁত-ঘোঁত ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ছারপোকা প্রাণপণে গলা সপ্তমে তুলে ডাকে, 'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে—তোমার মত ভাল মানুষ আর হয় না। তুমি কচি ঘাসের ওপর দিয়ে গরু চরালে বলেই তো বেড়াল দুধ পেল। সেই দুধ খেল বলেই তো বেড়াল আর কাঠঠোকরার ছানা খায় না। কাঠঠোকরাও তাই আর ওক-গাছের গোড়া ঠোকরায় না। ওক-গাছ তাই ভারে ভারে ফল দিল। সেই ফল পেট পুরে খেল বলেই তো বুনো শুয়োর ছারপোকা ভাইকে তার কুঁচি দিল। সেই কুঁচির আগা ধরেই তো আমি ডাঙায় উঠে প্রাণ বাঁচালাম। ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন!'

রাখাল এর উত্তরে কী বলে শোনার জন্যে ছারপোকা কান খাড়া ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। মাছিও তাই।

ছারপোকা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। মাছিও অপেক্ষা করে।

ছারপোকা ভাবে, 'আমি যদি একটু কাশির শব্দ করি, লোকটা উঠতেও পারে।' এই ভেবে সে জোরে কাশতে আরম্ভ করল। সেই শুনে মাছিও কাশতে শুরু ক'রে দিল।

এমনি ক'রে অনেকক্ষণ কেটে যায়। কতক্ষণ তা কেউ জানে না। শেষটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেশে কেশে ছারপোকার বিরক্তি ধরে যায়; মাছিকে বলে, 'মাছি ভাই, আর পারা যায় না। লোকটার নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে কথা কওয়ার ইচ্ছে নেই।'

যেই না বলা অমনি রাখাল ছেলে হঠাৎ আচমকা পাশ ফিরে

শুল — আর পড়বি তো পড়্ একেবারে ছারপোকা আর মাছি বেচারাদের ঘাড়ে। মাছি আর ছারপোকা তো চোখে সর্ষের ফুল দেখে। মড়মড় ক'রে ওঠে তাদের দুজোড়া পায়ের হাড়।

কোনরকমে তারা লাফিয়ে একটা ঘাসের ডগায় উঠে এ ওর দিকে তাকায়। হায়, ছারপোকার একটা পায়ের পাতা খসে পড়ে গেছে আর মাছিকে তার একটা আস্ত ঠ্যাং হারাতে হয়েছে।

তারপর দুজনে গলা জড়াজড়ি ক'রে কী কান্না! একে সারা গা ব্যথায় টনটন করছে, তার ওপর রাগে দুঃখে চোখ ফেটে তাদের জল গড়াচ্ছে।

ছারপোকা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, 'পায়ের একটা পাতাই যখন গেল, আর বেঁচে কী হবে? হায়রে! পোড়াকপাল আমার।'

মাছি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে। আর বলে, 'ওগো, বনের দেবতা! কোন্ পাপে এ শাস্তি দিলে আমায়। একটা আস্ত ঠ্যাংই যখন গেল, বেঁচে কী লাভ আমার?'

মাছি আর ছারপোকার কান্না আর থামে না। তারা যে কতক্ষণ কাঁদল, সে খবর কেউ জানে না। শেষটায় তাদের প্রচণ্ড ক্ষিধে আর তেষ্টা পায়। তখন তারা চোখের জল মোছে। মাছি ছারপোকাকে ডেকে বলে, 'দাদা গো, এখন আমরা হতভাগারা যাই কোথায়? কোথায় গিয়ে কী খেয়ে এখন ক্ষিদে-তেষ্টা মেটাই?'

বিজ্ঞ ছারপোকা অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে কী ভাবে। তারপর ঘাসের গায়ে চোখের জল মুছে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছারপোকা মাছিকে বলে, 'তোমারও ঠ্যাং নেই, আমারও পায়ের পাতা নেই। দুষ্টু রাখালটাই যত নষ্টের গোড়া। তার চেয়ে এসো, ওর গায়ে লেগে থেকে কড়ায় গণ্ডায় এর প্রতিশোধ আদায় করি। তা ছাড়া এমন গরিব লোক ভূ-ভারতে আমাদের আর মিলবে না।'

মাছি আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'তোমার মুখে, ভাই,

ফুলচন্দন পড়ুক। দুষ্টু রাখাল আমাদের যখন একেবারে চিরজীবনের মত পঙ্গু ক'রে দিয়েছে, তখন যে কদিন বেঁচে আছি ওর ঘাড়ে চেপেই খাব।'

এরপর থেকে গরিব রাখালের ঘাড়েই থাকা খাওয়া যাবে — দুজনে এই যুক্তি এঁটে ছুটে গিয়ে সুড়ুত ক'রে রাখালের কাপড়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ল। সেখানে তারা মনের সুখে খেয়েদেয়ে আর আনন্দে আটখানা হয়ে নিজেদের কাটা পায়ের কথাও কিছুদিন পরে ভুলে গেল।

গরিব রাখালের ময়লা কাপড়ে কতদিন যে তারা বসবাস করেছিল, সে খবর আজও জানা যায় নি।

ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই

এক যে ছিল দেশ। সেই দেশে হানা দেয় এক ড্রাগন। ড্রাগন কোত্থেকে আসে কেউ জানে না। হুম্ হুম্ হুমা···হুম্ হুম্ হুমা··· শুনে সবাই শিউরে ওঠে — ড্রাগন আসছে, ড্রাগন! ড্রাগনের পায়ের দাপে বন-পাহাড় কাঁপে! নাক দিয়ে হিসহিসিয়ে ওঠে ঝলকে ঝলকে আগুন। লম্বা হাত বাড়িয়ে চাষীদের ধরে আর পিছমোড়া ক'রে বেঁধে চালান দেয় তার নিজের রাজ্যে। সেখানে তাদের দিয়ে নিজের জমিতে বেগার খাটায়। আর ড্রাগনের জমির না আছে শেষ, না আছে অন্ত।

অগুন্তি তার সেপাই বরকন্দাজ। চাষীদের তারা অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখে। কাজে একটু ঢিলে দিলেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে গর্দান। শরীর একটু অসুস্থ হলে সেপাইরা চাষীদের পিটিয়ে লাশ বানায়।

এমনি ক'রে ড্রাগনের রাজ্যে চোখের জলে চাষীদের দিন কাটে। তাদের কঙ্কালের সারে সবুজ হয়ে ওঠে মহালের মাটি।

এমন সময় সেই দেশে চারিদিকে জল-থৈ-থৈ এক গভীর বনের

মধ্যে গরিবের ভাঙা কুঁড়ে ঘর আলো ক'রে জন্ম নিল অসিলক।

দেখতে দেখতে বনস্পতির মত বেড়ে ওঠে অসিলক; মাথায় যেমন ঢ্যাঙা, গায়ে তেমনি অসুরের মত শক্তি। ছোটবেলা থেকে অসিলক তার বাপের মুখে শয়তান ড্রাগনের অত্যাচারের কাহিনী শোনে — শোনে চাষীদের চোখের জলের ইতিহাস।

শোনে — আর রাগে তার সমস্ত শরীর রী-রী ক'রে ওঠে। শয়তান ড্রাগনকে সে শাস্তি দেবে, গোলামির ফাঁস খুলে ফেলে চাষীদের সে মুক্তি দেবে।

এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে অসিলক রাস্তায় পা বাড়ায়। অসিলকের বাবা ছেলেকে ফেরাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। বলেন:

'বাছা আমার, কোথায় চলেছিস তুই? প্রাণের কি তোর মায়া নেই? নইলে এমন অকালে কেউ কি সাধ ক'রে নিজেই নিজের কবর খুঁড়তে চায়! আমাকে বল্, কেন তুই মরতে যমের মুখে যাচ্ছিস?'

অসিলক বলে, 'চাষীদের লাঞ্ছনার কথা শুনে, অনাথ আর শিশুদের চোখের জল দেখে, বাবা, আমি স্থির থাকতে পারছি না। আমি চললাম — ড্রাগনের হাত থেকে তাদের আমি উদ্ধার করব।'

'কিন্তু হাজার হাজার লোককে যে গোলাম বানিয়ে রেখেছে, তার সঙ্গে তুই একা কী ক'রে লড়বি?'

অসিলক তবু নাছোড়বান্দা। বলে, 'শয়তান ড্রাগন যতদিন ধ্বংস না হচ্ছে, ততদিন আমাদের কিংবা আমাদের ছেলেপুলে নাতিপুতিদের বেঁচে থেকে সুখ নেই।'

অসিলকের বাবা তখন ছেলেকে বলেন, 'তুমি যা ভালো মনে করেছ, তাই করো। এ কথা আমিও মানি — চাষীরা যে হালে আছে তাকে বাঁচা বলে না।'

অসিলক সকলের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে ভয়ঙ্কর ড্রাগনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

অসিলক ঘুরে ঘুরে সারা। কোথাও ড্রাগনের টিকি দেখা যায় না। ড্রাগন আর ড্রাগনের রাজ্য যেন মাটির মধ্যে ধুলো হয়ে মিলিয়ে গেছে।

এমন সময় এক থুরথুরে বুড়োর সঙ্গে দেখা।

বুড়ো অমায়িক ভাবে বলে, 'কিগো বাছা, কোথায় যাও? আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়, বলতে পারো।'

অসিলক তাকে সব কথা খুলে বলে। বলে, 'হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে, ঠাকুদ্দা। তিন তিন জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল — কিন্তু কোথায় ড্রাগন, কোথায় কী!'

বুড়ো বলে, 'পশ্চিমে যাও — কিছুদূর গেলে পাথরের একটা প্রকাণ্ড দেয়াল দেখতে পাবে। সেই দেয়াল পেরিয়ে ড্রাগনের রাজ্য। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো — ড্রাগনকে যদি বাগে পাও, কিছুতেই ছেড়ো না। ও তোমাকে দুনিয়ার যা কিছু ভালো জিনিস দিতে চাইবে — খবর্দার, যেন ভুলেও বিশ্বাস ক'রো না। মনে রেখো, চাষীদের রক্ত আর ঘাম দিয়ে তৈরি হয়েছে তার ধনদৌলত। মানুষের কঙ্কালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাসাদ। শয়তান রাক্ষসটাকে যদি কোনরকমে কাবু করতে পারো, তাকে টানতে টানতে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চার কোণে আগুন লাগিয়ে দিও। তারপর তার চিতাভস্ম হাওয়ার মুখে উড়িয়ে দিও — দুনিয়ায় যেন ড্রাগনের আর কোনো চিহ্ন না থাকে।'

বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়ে অসিলক আবার ড্রাগনের খোঁজে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করে। গভীর বনের ভেতর দিয়ে জলকাদা ভেঙে খরস্রোতা নদী আর অতলস্পর্শ হ্রদ পেরিয়ে দিন নেই রাত নেই ক্রমাগত সে চলে। তবু ড্রাগনের রাজ্য মেলে না।

যে-তে যে-তে যে-তে, শেষকালে সে খুব উঁচু একটা পাঁচিল দেখতে পায়। কিন্তু ভেতরে ঢোকার কোনো রাস্তা নেই। অসিলক দেয়ালের গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করে — কিন্তু এত পেছল যে ধরার

কোনো জায়গা খুঁজে পায় না। তখন সে দেয়ালটা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তিন দিন, তিন রাত্রি সমানে হেঁটেও সে দেয়ালের কোনো খেই খুঁজে পায় না। অসিলক রাগে দিশেহারা হয়ে পড়ে। চার-মণী এক পাথর তুলে দেয়ালের গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারে।

সেই প্রচণ্ড আঘাতে পাথরের দেয়াল ঠিক যেন বালির মতো ঝুর-ঝুর ক'রে ভেঙে পড়ে। আর সেই ভাঙা পাথরের ওপাশে যেই পা দেওয়া, অমনি চিল যেমন মুর্গীর দিকে তুরন্ত পাখসাটে ধেয়ে আসে, তেমনি ভাবে চোয়ালের পাটি বার ক'রে তেড়ে এল ড্রাগন! গপ ক'রে সে অসিলককে গিলে ফেলে আর কি!

এমন সময় অসিলক একমুঠো বালি তুলে নিয়ে ধাঁ ক'রে ড্রাগনের চোখে ছুঁড়ে মারে। চোখে বালি লাগায় ড্রাগন বুনো জানোয়ারের
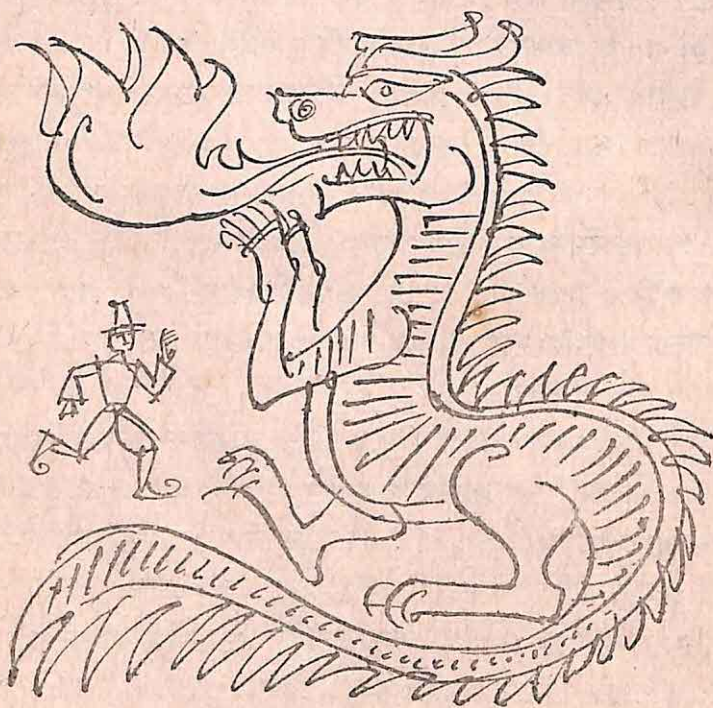
মতো ককিয়ে ওঠে ; লকলকে লম্বা জিভ বার ক'রে মাটিতে সমানে থুথু ফেলে আর যন্ত্রণায় আছড়া-আছড়ি করে।

অসিলক তখন তার জিভ টেনে ধরে পাকে পাকে হাতে জড়িয়ে নিয়ে তাকে ঘেঁষটাতে ঘেঁষটাতে নিয়ে চলে।

ড্রাগনের চিৎকারে মনে হয় যেন এক সঙ্গে হাজারটা নেকড়ে হুঙ্কার ছাড়ছে। অসিলক ড্রাগনের জিভটা ছেড়ে দিয়ে একটা গুঁড়িসুদ্ধ ওকগাছ মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে তার মাথা সই ক'রে ঘোরায়।

ড্রাগন তখন মানুষের গলায় কাকুতি-মিনতি করে, 'অসিলক, আমায় মেরো না — দোহাই তোমার, আমাকে প্রাণে মেরো না। তুমি যা চাও, তাই দেবো। অর্ধেক রাজত্ব চাও, অর্ধেক রাজত্ব দেবো। তোমার সারা গা আমি সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো।'

অসিলক হেসে উড়িয়ে দেয় ; বলে, 'আমি তোমার কাছে সোনা-দানার জন্যে তো আসি নি। তোমার ও-সোনা ফলেছে চাষীদের হাতে। তুমি তাদের সেই হাতে পরাধীনতার যে শেকল পরিয়েছ, সেই শেকল আমি ভাঙতে এসেছি। তোমার পাপের শাস্তি পেতে হবে।'

ড্রাগন বলতে যাচ্ছিল, অসিলকের হাতে সে সমস্ত চাষীকে ছেড়ে দেবে — কিন্তু তার মুখ খোলার আগেই অসিলক এক ঘায়ে তার মাথার খুলি চৌচির ক'রে দেয়।

তারপর ড্রাগনের ঠ্যাং দুটো ধরে টানতে টানতে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে যায়। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় শুইয়ে দিয়ে অসিলক বাড়ির চার কোণে আগুন ধরিয়ে দেয়। ড্রাগনের সেপাই বরকন্দাজের দল ছুটে এসে অসিলকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে জোয়ান লোকটার ঠ্যাং ধরে সে এত জোরে ঘোরায় যে, দেখে মনে হয় যেন ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে। অসিলক তাকিয়ে দেখে ড্রাগনের বাদবাকি সেপাইরা সব হাওয়া।

ড্রাগনের প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অসিলক

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর চাষীদের খোঁজে গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়ে। গাঁয়ের দিকে যেতেই দেখে ভিড় ক'রে চাষীরা প্রাসাদের আগুন দেখছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস ক'রে কী যেন বলা-কওয়া করছে।

তারা বলছিল, 'ড্রাগন যদি আবার আমাদের দিয়ে নতুন কোঠা ওঠায়, তবে তো জান সারা হয়ে যাবে। যদি বাড়ির সঙ্গে ড্রাগনও পুড়ে মরত, তাহলে বাঁচা যেত।'

অসিলক চাষীদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা ভাবে, অসিলক রাজার কোনো নতুন সেপাই। সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখে চাবি দেয়।

অসিলক তাদের ডেকে বলে, 'চাষী ভাই, তোমাদের ভয় কিসের? আমিও তোমাদেরই মতো একজন চাষী। নাম আমার অসিলক।'

উত্তরে একজন বলে, 'তবে তো তোমাকে জীবনভর জ্বলতে পুড়তে হবে।'

অসিলক বলে, 'না, না, ভয় নেই। তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। আর ড্রাগনের ভয় নেই। ড্রাগন আর ইহজগতে নেই। তার ছাই পর্যন্ত ধোঁয়ার সঙ্গে ফুঁ হয়ে উড়ে গেছে।'

শুনে চাষীদের আনন্দ আর ধরে না। অসিলককে ফুর্তিতে জড়িয়ে ধরে তারা নাচ আর গান জুড়ে দেয়।

চাষীরা তারপর যে যার দেশের ভিটেতে ফিরে যায়; ছেলেপুলে নিয়ে নিজেদের খেত-খামারের ফসল নিজেরা ভোগ ক'রে সুখে শান্তিতে ঘর করতে থাকে।

আর অসিলক যায় সে-ই দেশে — যে-দেশে এখনও অনেক চাষী ড্রাগন আর ড্রাগনের সেপাইশান্ত্রীদের পরাধীনতার শেকলে বাঁধা রয়েছে।

সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন দুনিয়ার সমস্ত চাষীর হাত থেকে দাসত্বের বাঁধন খসে পড়বে।

যার কাজ তারে সাজে

এক গাধার সঙ্গে ভাব হল এক খরগোশের। ঢিমে তেতালায় চলে বলে গাধাটার নাম ঢ্যামসা। আর চটপট ছোটে বলে খরগোশের নাম ছোট্টু। দুজনে রোজ দেখা হলে তারা মনের কথা খুলে বলে। এমনি ক'রে আলাপ ওঠে জমে।

এক সন্ধ্যায় ছোট্টু তার বন্ধুকে বলে, 'আমরা যে অনেকটা এক রকমের দেখতে — এটা তোমার মনে হয়েছে কখনও, ঢ্যামসা ভাই? মাথার গড়ন দেখ — দুজনেরই এক রকমের। তোমার আমার দুজনেরই লম্বা-লম্বা কান।'

ঢ্যামসা বিজ্ঞের মতো মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'ঠিক বলেছ, ছোট্টু ভাই। আগে তো এটা ভেবে দেখি নি। তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।'

উৎসাহ পেয়ে ছোট্টু বলে, 'অবশ্যই আমাদের দুজনের দু-রকমের স্বভাব; তবে সেটা নেহাতই গড়নের একটু-আধটু তফাতের জন্যে। তুমি যদি আমার মতো বেঁটে-খাটো হতে, তাহলে তোমার আর আমার প্রকৃতির নিশ্চয়ই আরও বেশি মিল হত। মাছি তাড়ানোর

জন্যে তোমার একটা লম্বা ল্যাজে লাগে — আমার তার দরকার নেই। কেননা আমি এত জোরে ছুটি যে, মশামাছি আমাকে ছুঁতেই পারে না।'

দুঃখ ক'রে ঢ্যামসা বলে, 'সত্যি ছোট্টু ভাই, ঐ একটা ভারি স্থবিধে তোমার। আহা, আমি যদি তোমার মতো ছোট হতাম — তাহলে মাছির হাত থেকে বাঁচতাম। সারাটা দিন ওরা আমাকে উস্তনখুস্তন ক'রে মারে।'

দুজনের মিলের কথা দুজনে যত ভাবে, ততই আহ্লাদে আটখানা হয়। ছোট্টু বলে, 'খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়েও আমাদের দুজনের খুব মিল আছে। তুমি আমি দুজনেই ঘাস ভালবাসি। তবে তোমার মুখের হাঁ-টা একটু বড়, তাই কাঁটা খেতে তোমার বাধে না। তুমি
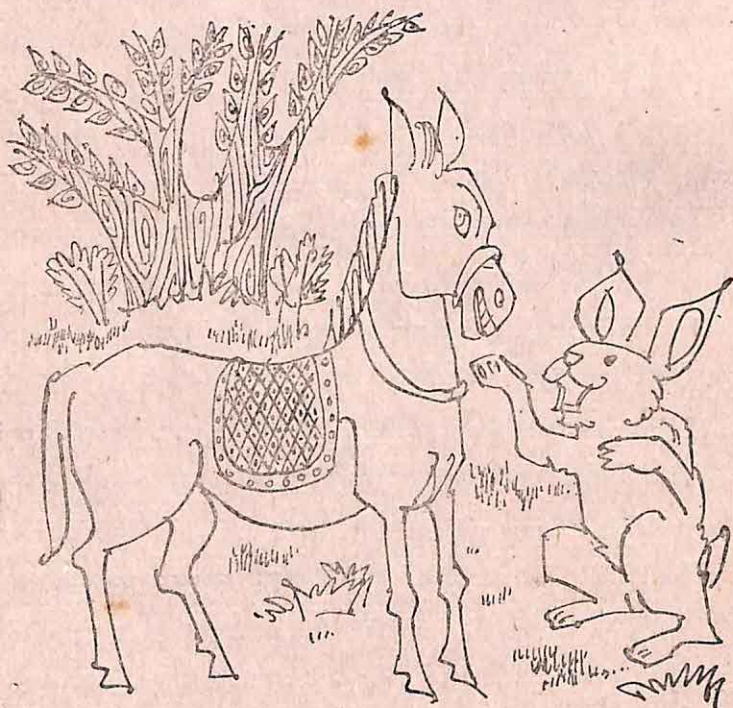
যদি আমার মতো ছোট হতে, তাহলে তোমারও কাঁটা খাওয়ার সাধ্যি হত না।'

ঢ্যামসা বলে, 'ছোট্টো হয়ে যদি মাছির হাত থেকে রেহাই পেতাম, তাহলে কাঁটা খাই বা না খাই, কিছু আসত যেত না।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে ছোট্টু। তারপর বলে, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে কী হয়? তুমি যদি আমি হও, আর আমি যদি তুমি হই? তাহলে আমরা একে অন্যকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারি। অনেক দিন থেকে আমার ঢ্যাঙা হওয়ার বড় সাধ।'

ঢ্যামসা বলে, 'আচ্ছা, ইচ্ছে করলে যদি তা হওয়া যেত, তবে দৌড়ে পাল্লা দিতাম আমি মাছির সঙ্গে। কিন্তু তা কি সম্ভব, ছোট্টু ভাই?'

ছোট্টু ভরসা দেয়। বলে, 'এক গুণীনের সঙ্গে জানাশুনা আছে আমার। তার কাছে গেলে সে ফুসমন্তরে আমাদের ভোল ঠিক বদলে দেবে। গুণীনটি থাকে নদীর ধারের ঘুরঘুট্টি বনে।'

ঢ্যামসা বলে, 'চলো, আমরা এখুনি যাই তার কাছে। আমি আর ত্বর সইতে পারছি না, ভাই। একঘেয়ে গাধার জীবনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। একটু নতুনত্ব পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।'

দুই বন্ধু তক্ষুনি যায় গুণীনের কাছে। তারা তাদের মনের কথা খুলে বলে গুণীনকে।

শুনে গুণীন বলে, 'বেশ, তোমরা যখন বলছ, তখন তোমাদের ভোল আমি বদলে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, পরে একা একা এসে যে আবার আগের ভোল ফিরিয়ে দিতে বলবে ওসব চলবে না। দুজনে একসঙ্গে এসে না চাইলে পুরনো ভোল কেউ ফিরে পাবে না। এতে যদি রাজী থাকো তো বলো। পরে মুশকিলে পড়লে আমাকে দোষ দিতে পারবে না কিন্তু।'

উত্তরে ঢ্যামসা বলে, 'না, না, ভয় পাবার কিছু নেই। দুই বন্ধু আমরা হরিহর-আত্মা। কোনো বিষয়ে কোনোদিন মতের তফাৎ

হয়নি আমাদের। আমি নিজে এর ষোলো আনা ঝুঁকি নিতে রাজী।'

ছোট্টুও আশ্বাস দেয় গুণীনকে, 'ঝুঁকি নিতে আমিও ষোলো আনা রাজী,— গুণীন মশাই। আমার বন্ধু যখনই আমাকে আবার খরগোশ হতে বলবে, আমি তক্ষুনি রাজী হবো।'

গুণীন তাদের কথা শুনে খুশি হয়। বলে, 'বন্ধুত্বের চেয়ে বড় জিনিস দুনিয়াতে আর কিছু নেই, বাছা। সব বাধা দূর হয় যদি বন্ধুত্ব থাকে। তোমাদের মতো সবাই যদি এমন মিলেমিশে থাকত, তাহলে পৃথিবী হত স্বর্গ।'

এই বলে গুণীন ফুসমন্তরে তাদের ভোল দিল বদলে ; গাধা হল খরগোশ আর খরগোশ হল গাধা।

বদলে-পাওয়া শরীর শোলার মতো হালকা বলে ঢ্যামসার মনে হল। মনের সুখে লাফাতে লাফাতে সে বলে, 'আজ কী মজাটাই না লাগছে। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে আমার! দেখ বন্ধু, আমি একটু ছুটে আসি।' এই বলে সে জঙ্গলের পথ ভেঙে তীরের মতো ছোটে। তারপর এক মাঠের মধ্যিখানে এসে একটু বসে জিরিয়ে নেয়।

ছোট্টু তার পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে ছুটে অনেকক্ষণ পরে মাঠের মধ্যিখানে এসে বন্ধুর দেখা পায়।

ছোট্টু বলে, 'আঃ! ভারি ভাল লাগছে আমার। লম্বা লম্বা ঠ্যাং কত আরামের। আমি এখন অনেক দূরের জিনিসও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমার শত্তুররা আর আচমকা এসে আমাকে ধরতে পারবে না।'

ঢ্যামসা বলে, 'আমার কাজটার ভার, ছোট্টু ভাই, তোমাকেই নিতে হবে। মনিব আমার এক্ষুনি আসবে — এসে তোমার পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে হাটে নিয়ে যাবে।'

ছোট্টু উত্তর দেয়, 'তোমার কাজ আমি স্বচ্ছন্দে ক'রে দেব। ঢ্যামসা ভাই, শরীরে অসম্ভব জোর পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে এখন

যেন পাহাড়ও পিঠে বইতে পারি।'

ঢ্যামসা বলে, 'আমার আর বোঝা বইবার শক্তি নেই বটে, তবে এখন থেকে মনের সুখে ঘুরতে পারব; ছুটে মাছিও আমার নাগাল পাবে না।'

ছোট্টু বলে; 'লম্বা ল্যাজের চাবুক থাকতে মাছি তো আমি থোড়াই কেয়ার করি। লম্বা ল্যাজ থাকাটা কী সুখের! সামনে প্রথম যে ছুটির দিন পাব, বসে বসে সেদিনটা মনের সুখে মাছি মেরে কাটাব। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার মাছির বংশ আমি একাই নির্বংশ করতে পারি।'

খোশগল্প করতে করতে তারা তাদের আস্তানায় ফিরে আসে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে একটা লোককে আসতে দেখে ছোট্টু তার বন্ধুকে বলে, 'আমি এবার সরে পড়ি, ভাই, — আমার শত্তুর আসছে।'

ঢ্যামসা তার উত্তরে বলে, 'কী পাগলের মতো বকছ যা-তা? ও তোমার শত্তুর হতে যাবে কেন? ও তোমার মনিব। পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে তোমাকে হাটে নিয়ে যাবে।'

ধমক খেয়ে ছোট্টুর হুঁশ হয়। বলে, 'ও মা, তাই তো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আমি এখন গাধা। দেখ তো কী বোকা আমি। মানুষকে আর এখন থেকে ভয় করতে হবে না — কী ফুর্তি!'

ঢ্যামসা বলে, 'আচ্ছা বন্ধু, এখন বিদায় হই। তোমার কাজ হয়ে গেলে সন্ধ্যের দিকে আবার আসব। সারা দিন কে কী দেখলাম গল্প করা যাবে।'

ফুর্তির সুরে ছোট্টু বলে, 'আচ্ছা বন্ধু, এসো। আশা করি দিনটা তোমার ভাল যাবে। নতুন জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছি, ভাবতেও আমার কী মজা যে লাগছে।'

যাবার সময় ঢ্যামসা তার বন্ধুকে বলে, 'যাবার আগে তোমার ভালর জন্যে একটা কথা বলে দিয়ে যাই। দেখো, যেন কাজে ফাঁকি

দিও না। আমি অবশ্য আগাগোড়াই একটু কুঁড়ে গোছের ছিলাম। একটু জোর কদমে হাঁটবে আর মনিব যা বলে তা শুনবে। তাহলেই দেখো দিব্যি পায়ে পা তুলে আরামে থাকবে। মনিবের একটা কথার অবাধ্য হয়েছ কি, অমনি সে লাঠিয়ে তোমায় লম্বা করবে।'

বন্ধুকে তার মূল্যবান উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট্টু বলল, 'তোমাকে কথা দিচ্ছি, ঢ্যামসা ভাই—আমি হব পয়লা নম্বরের গাধা। প্রাণপণে জোরে হাঁটব আমি। তা ছাড়া আমার নিজেরও হাটবাজার দেখার শখ তো কম নয়।'

তারপর মনিব এসে মাঠ থেকে ছোট্টুকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। যেতে যেতে মনিব তো অবাক। এ গাধা যেন সে গাধাই নয়। কী রকম চলবলিয়ে হাঁটে। কথার কী বাধ্য!

ভারি খুশি হয় মনিব। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পিঠে মালপত্তর চাপাতে চাপাতে বলে, 'হাটে যাবার সময় যদি এমনি ভাবে যাস, ফিরে এসে খুব ভাল খাওয়াব তোকে।'

রাস্তায় বেরিয়ে ছোট্টু এত জোরে হাঁটে যে, তার মনিব তার সঙ্গে হেঁটে পারে না। যে সব হাটুরে আগে আগে তাদের গাধা নিয়ে রওনা হয়েছিল, তারা সব কো-ন্ পেছনে পড়ে যায়। ছোট্টুর মনিব তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বড়াই ক'রে বলে, 'দাদা, লাখ গাধার এক গাধা আমার।' যাদের লক্ষ্য ক'রে কথাগুলো বলা, তারাও গাধাটার খুব তারিফ করে। বলে, 'সত্যি, গাধার মতো গাধা তোমার।' বলে নিজের নিজের ঢিকিয়ে-চলা গাধার পিঠে তারা রেগে চাবুক কশায়।

এদিকে হাট দেখার জন্যে এতক্ষণ ছটফট করছিল ছোট্টু। তারপর মনিবের মুখে নিজের গুণগান শুনে তার মাথাও ঘুরে গিয়েছিল। এইসব পাঁচ কারণে পিঠের বোঝার কথাও সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

রাস্তার একপাশে এককোণে তার দিকে একটা কুকুরকে ঘেউ-

ঘেউ ক'রে ছুটে আসতে দেখে হঠাৎ পেছন ফিরে মরিবাঁচি ক'রে মাঠের দিকে ছুট দেয় ছোট্টু। সে যে এখন আর খরগোশ নেই, একথা তার তখন মনেই নেই।

মনিব তো রেগে খুন, ছোট্টুর পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে কত ডাকাডাকি করল — কিন্তু কে কার কথা শোনে!

এদিকে মাঠের মধ্যে খানিকক্ষণ বসে ঠাণ্ডা হয়ে ছোট্টুর কাছে তার নিজের মস্ত বড় ভুল হঠাৎ ধরা পড়ল। সে যে এখন খর-গোশ নয়, গাধা। কাজেই কুকুর দেখে ভয় করার কী আছে!

তখন তার লজ্জা হল। রাস্তায় মনিবের কাছে সে ঘাড় হেঁট ক'রে ফিরে গেল।

কিন্তু মনিবের রাগ তখনও পড়ে নি। ছোট্টুকে আসতে দেখে তাকে বেদম পিটতে শুরু ক'রে দিল। যন্ত্রণায় ডাক ছেড়ে কাঁদতে দেখে একটু পরে মায়া হল মনিবের। ছোট্টুকে বলল, 'তুই কাঁদছিস দেখে এবারটা ছেড়ে দিলাম। নে এখন একটু জোরসে হাঁটা দে। নইলে হাটের সময় উৎরে যাবে।'

ছোট্টু জোরে জোরে পা চালিয়ে ঠিক সময় হাটে এসে পৌঁছোয়। মনিব তার পিঠ থেকে মালপত্তরগুলো নামিয়ে নিলে ভারি সোয়াস্তি হয় তার। তারপর ঠিক খরগোশের মতো ভাবভঙ্গি ক'রে বসে বসে ছোট্টু একমনে কী যেন ভাবে।

এদিকে ছোট্টুকে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে তার চারপাশে একদল ছেলে এসে ভিড় করে। একজন বলে, 'দেখ ভাই, দেখ — কোথাকার এক আজুবে গাধা, ঠিক যেন খরগোশের মতো দেখতে। আয় সব, ওকে নিয়ে মজা করা যাক।'

এই বলে তারা ছোট্টুর গায়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ছোট্টু দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে বাজারের রাস্তা দিয়ে চোখ-কান বুঁজে ছুটতে থাকে। রাস্তার এককোণে বসে এক তেলীবউ তেল বিক্রি করছিল; ছোট্টুর পায়ে লেগে তার সব তেল মাটিতে পড়ে গেল।

তারপর এক ফলওয়ালার ঝুড়ি উলটিয়ে সব ফল তছনছ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোট্টু পাশের এক সরু গলিতে ঢোকে। মোড়ের মাথায় দুটো লোককে মাটিতে চিৎপটাং ক'রে ফেলে দিয়ে এক স্যাকরার দোকানে ঢুকে ছোট্টু দু' দণ্ড জিরিয়ে নেবার জন্যে চুপটি ক'রে এককোণে গিয়ে বসে।

এদিকে বাজারময় হুলুস্থুলু। গাধার মালিক রেগে আগুন হয়ে ছোট্টুকে ধরার জন্যে ছোটে। বাজার ভেঙে লোক তার পেছনে এসে জড়ো হয়। গাধাটাকে স্যাকরার দোকানের এককোণে যখন পাওয়া গেল, তখন ভয়ে সে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। সেই অবস্থায় তার পিঠে মালিকের চাবুক পড়ে সপাং সপাং ক'রে।

তেলীবউ এসে চোখ রাঙিয়ে গাধার মালিককে বলে, 'আমার তেলের দাম মিটিয়ে দাও।'

ফলওয়ালা এসে বলে, 'আমার ফলের দাম চুকিয়ে দাও।'

যে লোক দুটো ছোট্টুর ধাক্কা সইতে না পেরে রাস্তায় ছিটকে পড়েছিল, তারা এসে বলে, 'আমাদের চোট লেগেছে, তার খেসারত দাও।'

গাধার মালিক সব শুনেটুনে বলে, 'দোষ তো আর আমার নয়। ছেলেগুলো গাধাটাকে যন্ত্রণা দিয়েছে বলেই তো এত সব কাণ্ড। তা রাজার কাছে চলো; সেখানে যা বিচার হবে, তাই আমি মান্‌বো।'

তখন তারা সবাই চলল রাজার কাছে। রাজা সব শুনেটুনে যা রায় দিলেন ,তা শুনে সবাই তাজ্জব।

রাজা বললেন, 'সত্যি সত্যি খুব কিছু ভয়ের কারণ না থাকলে কি আর গাধার জাত অমন মরি-বাঁচি ক'রে ছোটে? আসল দোষ ঐ বেয়াড়া ছেলেগুলোর। কাজেই যার যা ক্ষতি হয়েছে, তার জন্যে গুনোগার দেবে ছেলেগুলোর বাপদাদারা।'

গাধার মালিকও বেশ কিছু টাকা খেসারত পেল।

তারপর ড্যাং ড্যাং ক'রে বাড়িমুখো রওনা হল তারা। গাধার মালিকের পকেটে ঝনঝন করে টাকা। তাই মেজাজও খুব দরাজ। ছোট্টুর পিঠে হাত বুলিয়ে মনিব বলে, 'তোর খুব লেগেছে, না রে? বাড়ি ফিরে তুই যা খেতে চাস তাই খাওয়াব।' তারপর নিজের মনেই বলে, 'কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ? বেশ দু পয়সা কামাই হল।' যেতে যেতে খুশিতে গান ধরে দেয় গাধার মালিক।

ছোট্টুও মনিবের মিষ্টি মিষ্টি কথায় পিঠের ব্যথা ভুলে যায়। দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। গাধাকে পাঁই পাঁই ক'রে ছুটতে দেখে দুপাশে লোক দাঁড়িয়ে যায়। তারা অবাক হয়ে বলে, 'দেখ দেখ, গাধা তো নয় — চলেছে যেন পক্ষিরাজ।'

কিছুক্ষণ ছোটার পর ক্লান্তিতে পা ভেঙে আসে ছোট্টুর। হঠাৎ তার মাথায় সোজা রাস্তা ধরার খেয়াল চাপে। আর অমনি বলা নেই কওয়া নেই হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়ে সে মাঠের আলবাঁধা রাস্তায়।

আচমকা মাঠে নামতে দেখে হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে গাধার মালিক। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ছোট্টু ভাবে মনিব তাকে আরও হাঁকিয়ে যেতে বলছে। এই ভেবে সে আরও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

কিন্তু একটু পরেই মনিবের রাগ পড়ে যায়। আপন মনেই বলে, 'মাথায় ওর পোকা নড়েছে। ওকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। চলুক, ও নিজের খেয়ালেই চলুক। বুঝেছি, সোজা রাস্তায় যেতে চায় ও।'

মাঠের পর একটা জঙ্গল। জঙ্গল পেরোলেই মনিববাড়ি। বনের ভেতর ঢুকতে গিয়ে এক ফ্যাসাদ। সামনে একটা গাছের ডাল নিচু হয়ে ছিল। পিঠে সওয়ার নিয়েছে ছোট্টু জীবনে এই প্রথম। ডালটায় বেধে মনিব যে মাটিতে উল্‌টে পড়ে যাবে, এটা সে আন্দাজ করতে পারে নি — খরগোশ গাধা হলে যা হয়। তাই গাছের নিচু ডালে চোট খেয়ে মনিবকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে

দেখে ছোট্টুর চোখ কপালে উঠল। এবার নির্ঘাত পিঠে তার সপাং সপাং চাবুক পড়বে। সেই ভয়ে সেখানে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ছোট্টু পোঁ পোঁ দৌড় দিয়ে তার সেই পুরনো আড্ডায় গিয়ে হাজির হল — যেখান থেকে বন্ধু ঢ্যামসার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে আপন মনেই সে বলতে লাগল, 'ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার — এবার ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। গাধা হয়ে আর কাজ নেই আমার; খরগোশ ছিলাম, বেশ ছিলাম — আবার খরগোশই হতে চাই।'

এমন সময় 'বাবা গো, গেলাম গো' বলতে বলতে ঢ্যামসা এসে সেখানে হাজির। পেছনে তার একটা ডালকুত্তা তাড়া করেছে। ছোট্টু সেই ডালকুত্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে এমন আঁচড়ে কামড়ে দিল যে সে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুটে পালাল।

তখন ঢ্যামসা তার বন্ধুকে বলে, 'তুমি না থাকলে, ছোট্টু ভাই, আজ নির্ঘাত আমার প্রাণ যেত।'

ছোট্টু বলল, 'ওসব শুনতে চাই না — যেমন ছিলাম তেমনি আবার আমি খরগোশ হতে চাই।'

ঢ্যামসা উত্তর দিল, 'আমিও তো তাই চাই।'

ছোট্টু বলল, 'এ বিষয়ে আমাদের দুজনেরই যখন মত রয়েছে, তখন চলো গুণীনের কাছে যাই।'

তারপর তারা দুজনে একসঙ্গে গুণীনের কাছে গেল।

এদিকে ঢ্যামসার কী হাল হয়েছিল শোনো।

ছোট্টু তো মনিবের সঙ্গে গেল হাটে মালপত্তর বইবার জন্যে। আর ঢ্যামসা ভাবল, 'আমার কী মজা! কাজ নেই কম্ম নেই — এখন বেশ মনের সুখে চরে বেড়াই। দিনটাও আজ তোফা। আর মাছির জ্বালাও সইতে হবে না।'

মাঠে ছুটতে ঢ্যামসার ভারি ফুর্তি লাগল। ঘণ্টা দুই শুধু সে পড়ে

পড়ে ছুটল।

দেয়ালের ছোট ছোট গর্ত আর বেড়ার ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে গলে যাবার সময় ভারি মজা লাগল ঢ্যামসার। এখন ইচ্ছে করলেই বড় বড় ঘাসের ঝোপের আড়ালে সে দিব্যি গা ঢাকা দিতে পারে।

কিন্তু কাঁহাতক আর একা একা ভাল লাগে? ঢ্যামসা তাই ঠিক করল, একবার পাশের গাঁ-টা ঘুরে দেখে আসবে অন্য সব গাধারা কিভাবে খাটাখাটনি করছে। এই ভেবে সে বুক টান ক'রে যেই বড় সড়কের দিকে পা বাড়িয়েছে, অমনি দেখতে পেল এক ডালকুত্তা আসছে হনহনিয়ে।

কার পেছনে ডালকুত্তা তাড়া করছে দেখার জন্যে খানিকক্ষণ রাস্তার ওপর দাঁড়ানোর পর ঢ্যামসার হুঁশ হল আসল শিকার সে নিজেই! তখন ছুটে পালাবে বলে যেই সে একপাশে পা বাড়িয়েছে, অমনি দেখে আরও একটা কুকুর সেদিক থেকে ছুটে আসছে।

ঢ্যামসার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। পালাবার সব পথ বন্ধ। যায় কোথা দিয়ে? তখন তার মনে হল— আহা, গাধা হয়ে থাকলে এসময় কী সুবিধেই না হত। এতক্ষণে পেছনের ঠ্যাংজোড়া চালিয়ে কুকুর দুটোর পেট ফাঁসিয়ে দেওয়া যেত।

বুকের পাটা ছিল তবু ঢ্যামসার। একটুও ভয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে রাস্তার মধ্যিখানে। তার আশা ছিল, কুকুর দুটো নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাবে আর সেই ফাঁকে ঢ্যামসা ছুটে পালাবে।

খরগোশটাকে ছুটে পালাতে না দেখে কুকুর দুটো হাত কয়েক দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। ওদের রকম দেখে ঢ্যামসা হি-হি-হো-হো ক'রে হেসে উঠে একবার এর মুখের দিকে চায়, একবার ওর মুখের দিকে চায়। খরগোশের মুখে গাধার হাসি শুনে কুকুর দুটো তো তাজ্জব। ঢ্যামসা ওদের ঘাবড়াতে দেখে ঘাড় উঁচু ক'রে আরও জোরে হি-হি-হো-হো শব্দে হেসে ওঠে।

হাসি শুনে হাত-পা হিম হয়ে আসে কুকুর দুটোর। তারা যে যেদিকে পারে ল্যাজ তুলে ছুটতে থাকে জঙ্গল লক্ষ্য ক'রে। যখন তারা একদম আড়ালে চলে যায়, তখন সে নিশ্চিন্ত মনে ঢোকে এক ধানক্ষেতের মধ্যে।

ধানক্ষেতে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে গাঁয়ের দিকে আবার রওনা হয় ঢ্যামসা। গাঁয়ের কাছাকাছি আসতে একদল ছেলে তাকে দেখতে পেয়ে 'মার মার' শব্দে তাড়া করে। প্রথমটা একটু ভয় হয়েছিল ঢ্যামসার। কিন্তু তারপর সে মনে মনে ঠিক করল, আগের চালটা এখানেও সে খাটিয়ে দেখবে। এই ভেবে সে রাস্তার মধ্যিখানে বসে পড়ল। তারপর ছেলেগুলো গোল হয়ে কাছে আসতেই সে হি-হি-হি-হো-হো-হো ক'রে হাসতে শুরু ক'রে দিল। অমনি ছেলের দল ভয়ে দে ছুট। সেই ফাঁকে ঢ্যামসা চট ক'রে লুকিয়ে পড়ল।

এদিকে ভয়-পাওয়া ছেলেদের মুখ থেকে এক হাসুকুটে খরগোশের কথা শুনে গাঁয়ের গেরস্তরা যে যার লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে এল; এমন অলক্ষুণে খরগোশ না মারতে পারলে তাদের সোয়াস্তি নেই।

গেরস্তদের মধ্যে একজন বলল, 'এ নিশ্চয় কোনো রাক্ষসখোক্কস হবে।'

আর একজন বলল, 'খরগোশটার মধ্যে নিশ্চয় শাঁখচুন্নী আছে।'

দলের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'এক্ষুনি ওকে নিকেশ করা যাক, এসো।'

তারা তন্ন তন্ন ক'রে সারাটা দিন খুঁজেও ঢ্যামসাকে বার করতে পারল না। একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে ছিল সে। ভেবে-ছিল, 'একটু পরে ওরা যেই আমার কথা ভুলে যাবে তখন সরে পড়ব। এখন বুঝতে পারছি, গ্রাম কেন খরগোশের যম।'

সন্ধ্যের অন্ধকারে ঢ্যামসা পালাতে যাবে, এমন সময় কোত্থেকে

এক বেড়াল মাটি শুঁকতে শুঁকতে এসে তাকে ধরে ফেলল। এবারও সে হি-হি-হো-হো ক'রে গমকে গমকে হাসতে শুরু ক'রে দিল। কিন্তু বেড়াল ভারি সেয়ানা। প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও ঢ্যামসার চালাকি সে একটু পরেই ধরে ফেলল। আর তারপরই লাফিয়ে পড়ল ঢ্যামসার ওপর। ঝট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢ্যামসা মরি-বাঁচি ক'রে ছুটতে লাগল যেদিকে দুচোখ যায় সেই দিকে। বেড়ালও ছুটল তার পিছু পিছু।

এমন সময় ঢ্যামসার কপালগুণে এক কুকুর করল বেড়ালকে তাড়া। কুকুর আর বেড়ালের মধ্যে বেশ খানিকটা খণ্ডযুদ্ধের পর বেড়াল গিয়ে উঠল এক বাঁশের মাথায়। তখন খরগোশের দিকে চোখ পড়তেই কুকুরটা তাকে তাড়া করল। ঢ্যামসা গলা ফাটিয়ে হি-হি-হো-হো ক'রে প্রাণপণে হাসে। কিন্তু হাসলে কী হবে? কুকুরটা যে এদিকে বদ্ধ কালা। তার কানে হাসির লেশমাত্র পৌঁছুল না! তখন আর উপায় নেই দেখে প্রাণপণে ছুটতে লাগল ঢ্যামসা। এমন সময় ছোট্টুর সঙ্গে দেখা। ছোট্টু ছিল বলে এ যাত্রা ঢ্যামসা বেঁচে গেল।

এইবার ছোট্টু আর ঢ্যামসা যায় গুণীনের বাড়ি। গিয়ে বলে, 'গুণীন মশাই, গুণীন মশাই—পুরনো ভোল আমাদের ফিরিয়ে দিন।'

গুণীন কতকগুলো মন্তরটন্তর পড়ে তাদের পুরনো ভোল ফিরিয়ে দেয়।

ছোট্টু বলে, 'ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভাই—এখন চলি।'

ঢ্যামসা বলে, 'গাধার শরীর ফিরে পেয়ে আরাম লাগছে। যাই, গাঁয়ে গিয়ে মনিবের সঙ্গে দেখা করি। কতদিন দেখি নি, মন কেমন করছে। আর আমার কুকুর, বেড়াল, ছেলেপুলে কিছুতেই ভয় নেই।'

তারপর বিদায় নিয়ে যে যার আস্তানার দিকে রওনা হয়।

রাস্তায় ঢ্যামসার সঙ্গে তার মনিবের দেখা। হাতে তার শক্ত মোটা একটা লাঠি। গাধাটার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মনিব বলে, 'দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি। আমার সঙ্গে বজ্জাতি? পড়ে গিয়ে পিঠটা আমার এখনও টনটন করছে। আমি আজ তোকে মেরে শেষ ক'রে ছাড়ব।'

এই বলে বেদম পিটতে লাগল ঢ্যামসাকে। অনেকক্ষণ মারার পর যখন হাতের ড্যানা ছুটো ধরে এল, তখন মনিব বলল, 'যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছি তোকে তোর বদখেয়ালের জন্যে। এবার তোকে তোর ভাল কাজের জন্যে বখশিস দেব। আয় তোকে পেট ভরে খাওয়াই।'

নাদা-ভর্তি ভাত গিলে ঢ্যামসা হাঁসফাঁসায়। আপন মনেই বলে, 'এর তো কিছুই মানে বুঝছি না আমি। প্রথমে ধরে মারল, তারপর আদর ক'রে খেতে দিল। সবই কেমন যেন হেঁয়ালি ঠেকছে।'

মনিব এসে তার পিঠ চাপড়ে বলে, 'সাবাস, এই তো চাই। এর পর যখন হাটে যাবি, আজকের মত জোরসে ছোটা চাই। কিন্তু বলে দিচ্ছি, হুঁশিয়ার — ফের বেচাল হয়েছ কি মরেছ!'

হাটের কথা শুনে গাধার গায়ে যেন জ্বর আসে। ভাবে, 'কেন মরতে ভোল বদলেছিলাম! এখন ঠ্যালা সামলাই কী ক'রে? খরগোশকে গাধা হতে দিয়ে কী মুখ্যুমিই না করেছি। এখন মালিককে তো একথা বোঝাতেই প্রাণ যাবে যে, গাধা কখনও ঘোড়া হয়? উনি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে চান — তার চেয়ে ঘোড়া পুষলেই তো পারেন।'

পরদিন সকালে আস্তাবলে মনিবের সঙ্গে এক ভিন্‌দেশী লোক এল ঢ্যামসাকে দেখতে। ঢ্যামসাকে দেখিয়ে লোকটা বলল, 'এই গাধাটাকেই তো কাল তুমি হাটে নিয়ে গিয়েছিলে?'

মনিব বলে, 'হ্যাঁ, ভাই।'

লোকটা তখন বলে, 'গাধাটাকে আমি কিনতে চাই। বেচবে?'

মনিব বলে, 'আগে দেবে কত সেইটা তো শুনি।'

লোকটা বলে, 'পাঁচ গাধার যা দাম হয় তাই দেব।'

মনিব বলে, 'উঁহুঁ, ওতে আমার লোকসান। দশ গাধার দাম পেলে বেচতে পারি।'

ভিন্‌দেশী লোকটা তাতেই রাজী হয়ে দেনাপাওনা চুকিয়ে ঢ্যামসাকে নিয়ে রওনা হল নিজের গাঁয়ে। কিন্তু কিছুটা আসতেই লোকটা বুঝতে পারল সে ভারি ঠকেছে। আসলে অন্য গাধার সঙ্গে এ গাধাটার কোনোই তফাত নেই। তখন দারুণ রেগে গিয়ে ঢ্যামসার পিঠে এমন জোরে লাঠি পেটাতে লাগল যে লাঠিটা ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

মার খেয়ে ঢ্যামসা তখন পালিয়ে গেল গুণীনের কাছে। তার কাছে সমস্ত খুলে বলার পর জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, এখন কী করা যায়, গুণীন মশাই।'

গুণীন বলে, 'মুশকিল আশানের একটাই পথ আছে। যদি এমন কাউকে পাও, যে তোমাকে কিছুক্ষণের জন্যে তার দেহ ধার দিতে পারে — তাহলেই তুমি হেসে-খেলে বেড়াতে পারো।'

আবার ভোল বদলানোর কথা শুনে ঢ্যামসা একটু দমে গেল। তবু ভাবল, দেখা তো যাক।

তারপর বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক হৃষ্টপুষ্ট বাঘের সঙ্গে তার দেখা। বাঘকে গিয়ে সে তার দুঃখের কথা খুলে বলল, শুনে বাঘ বলল, 'তোমার নতুন মনিবটি দেখতে কেমন হে? বেশ পুরুষ্টু গোছের তো?'

ঢ্যামসা বলে, 'তা গতর তাঁর নেহাত কম নয়।'

শুনে বাঘের জিভে জল আসে। বলে, 'ভাই, আমাকে তোমার শরীরটা একদিনের জন্যে ধার দাও না!'

তারপর তারা দুজনে গুণীনের কাছে যায়। গুণীনকে দিয়ে

নিজেদের ভোল বদলে নেয় তারা। বাঘ তখন গাধা সেজে ঢ্যামসার নতুন মনিবের গাঁয়ে যায়। মনিব তার গাধাকে দেখতে পেয়ে ধরে বেঁধে নিয়ে যায় জঙ্গলে। সেখানে মোটা দেখে এক বাঁশ কেটে তাকে পেটাতে যাবে, এমন সময় হালুম ক'রে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে গাধার বেশে বাঘ মনিবকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে খেয়ে ফেলল। গাঁয়ের যারা সেখানে জড়ো হয়েছিল মজা দেখতে, তারা তো সেই দেখে 'বাবা রে, মা রে' বলে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।

বাঘ তখন গাধার কাছে গিয়ে বলে, 'এবার গুণীনের কাছে গিয়ে যে যার ভোল ফিরিয়ে নিই, চলো।'

বাঘের দাঁতে কি ঘাস আর কাঁটা চিবুনো যায়? — ঢ্যামসা তাই গাধার দেহে ফিরে যেতে পারলে বাঁচে।

ঢ্যামসা আবার গাধা হয়ে ফিরে আসে গাঁয়ে। ঢ্যামসাকে দেখতে পেলে গাঁয়ের লোকে ভয়ে পালায়। তাই সে মনের সুখে যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়ায়। বনের দুর্দান্ত জানোয়াররা পর্যন্ত তাকে খাতির ক'রে চলে। সুখে শান্তিতে দিন কাটে ঢ্যামসার।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন ছোট্টুর সঙ্গে দেখা হয়। ঢ্যামসা বলে, 'ছোট্টু ভাই, আছ কেমন?'

ছোট্টু জবাব দেয়, 'ভালই আছি, ভাই ঢ্যামসা। খরগোশ হয়ে বেশ আছি! আর আমি তোমার সঙ্গে কখনও ভোল বদলাতে চাইব না।'

ঢ্যামসা বলে, 'শুনে খুব খুশি হলাম, ছোট্টু ভাই। আমিও তোফা আছি। কথায় বলে, যার কাজ তারে সাজে, অন্যে পরে লাঠি বাজে। খরগোশ হবে খরগোশ, আর গাধা হবে গাধা। নইলে সংসার চলবে কেন?'

এক যে ছিল আঁকিয়ে

অনেক, অনেকদিন আগের কথা।

এক বাপ-মা-মরা ছেলে ছিল। তার নাম মা-লিয়াং। ছোট থেকেই তাকে বনের কাঠকুটো কুড়িয়ে নিজের পেট চালাতে হত। ছেলেটা খুব চালাকচতুর। তার খুব শখ সে ছবি আঁকতে শিখবে। কিন্তু তুলি কেনবার পয়সা জোটে নি।

একদিন সে এক পাঠশালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশাই তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকতে শেখাচ্ছিলেন। মা-লিয়াং একমনে দেখতে দেখতে কখন যে পাঠশালার ভেতর ঢুকে পড়েছিল নিজেই জানে না। মা-লিয়াং পণ্ডিতমশাইকে ডেকে বলল, 'আমি ছবি আঁকা শিখতে চাই। আমাকে একটা তুলি ধার দেবেন?'

পণ্ডিতমশাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, ভিখিরি হয়ে তুই ছবি আঁকতে চাস? শখ কম নয়।' ছেলেটাকে তিনি হাঁকিয়ে দিলেন।

কিন্তু মা-লিয়াং কিছুতেই দমল না।

সে আপন মনে বলল, 'গরীব তো হয়েছে কি! তাই ব'লে ছবি আঁকতে শিখব না কেন?'

মা-লিয়াং ঠিক করল যেমন ক'রে হোক ছবি আঁকা শিখবে। রোজ সে পুরোদমে ছবি আঁকা শিখতে লাগল। যখন সে পাহাড়ে জ্বালানী কাঠ আনতে যেত, একটা কাঠি দিয়ে বালির ওপর পাখি আঁকত। যখন সে নদীতে উলু তুলতে যেত, জলে আঙুল ডুবিয়ে পাথরের গায়ে মাছ আঁকত। ঘরে ফিরে সে তার গুহায় তার আসবাবপত্রের ছবি এঁকে এঁকে দেয়াল ভরিয়ে ফেলল।

কিছুদিনের মধ্যেই তার হাত বেশ পাকা হয়ে উঠল। লোকে যারা তার ছবি দেখত, তারা ভাবত এখুনি বুঝি আঁকা পাখি উড়ে যাবে। আঁকা মাছ জলে পালাবে। এত অবিকল হত। কিন্তু মা-লিয়াঙের তখনও তুলি জুটল না।

একদিন সারাদিন ছবি এঁকে ক্লান্ত হয়ে রাত্তিরে সে রং আর
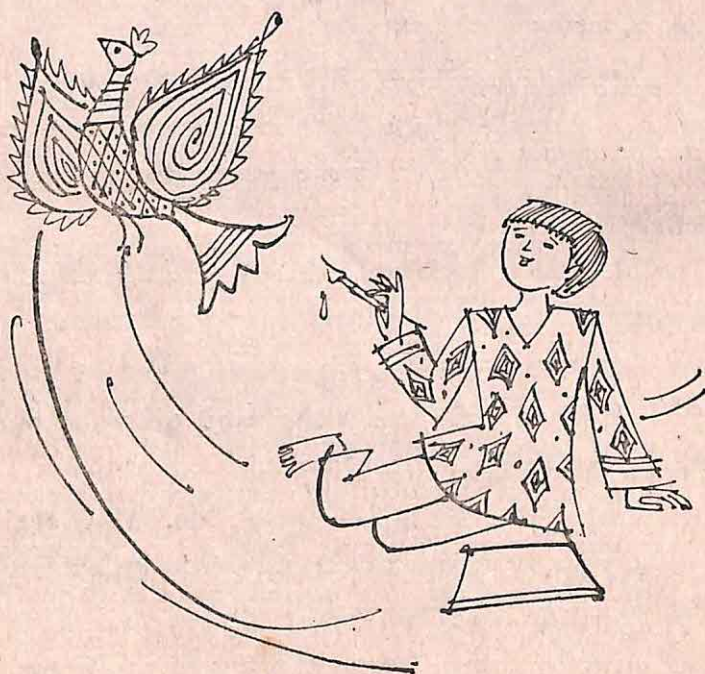
কলম রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সময় এক শাদা দাড়িওলা বুড়ো এসে তাকে একটা তুলি দিয়ে গেল।

বুড়ো বলল,…'রয়ে…সয়ে…এঁকো, এটা মন্ত্রপড়া তুলি।'

মা-লিয়াং হাতে নিয়ে দেখে তুলিটা সোনার। একটু ভারী।

আনন্দে আটখানা হয়ে বলল, 'বাঃ, কী সুন্দর! অনেক ধন্যবাদ।'

মুখের কথা ফুরুতে না ফুরুতে বুড়ো অদৃশ্য হল।

মা-লিয়াং ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠল। তাহলে ওটা স্বপ্ন শুধু! কিন্তু হাতের মধ্যে যে তার মন্ত্রপড়া তুলি! সে অবাক হল।

সেই তুলি দিয়ে একটা পাখি আঁকতেই পাখা ঝটপট করতে করতে পাখিটা উড়ে গেল! মাছ আঁকতেই জলে পাখনা ঝাপ্টে সাঁতার কাটতে লাগল! তার কী আনন্দ!

এই মন্ত্রপড়া তুলি দিয়ে মা-লিয়াং গাঁয়ের গরীবদের যার যা নেই রোজ একটা ক'রে তাই তাকে এঁকে দিতে লাগল — কাউকে লাঙল, কাউকে বাতি, কাউকে বালতি।

কিন্তু একদিন এই খবর গাঁয়ের জমিদারের কানে পৌঁছুল। তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে দু'জন পেয়াদা পাঠিয়ে দিল। তার হয়ে ছবি আঁকতে হবে।

কিন্তু ছোট হলেও মা-লিয়াঙের ছিল বেজায় সাহস। সে ওসব বড়লোকদের হাড়ে হাড়ে চেনে। ভয় দেখানো সত্ত্বেও, তোয়াজ করা সত্ত্বেও একটা ছবিও সে আঁকল না। তখন মহাজন তাকে আস্তাবলে বন্দী ক'রে রাখল এবং খাওয়া বন্ধ ক'রে দিল।

তিনদিন পর খুব বরফ পড়ল। সন্ধ্যের দিকে মাঠেঘাটে পুরু হয়ে জমল বরফ। মহাজন ভাবল, যাই দেখে আসি। না খেয়ে, হয়ত ঠাণ্ডায়, ছেলেটা নির্ঘাত পটল তুলেছে। কাছে এসে দেখে দরজার ফাঁক দিয়ে আগুন দেখা যাচ্ছে আর সুন্দর সুন্দর খাবারের গন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে মা-লিয়াং আগুন পোয়াচ্ছে গরম আর গরম পিঠে খাচ্ছে। জমিদার মশাইয়ের যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস

হচ্ছিল না। তখন তার মনে পড়ল, এ নিশ্চয় মা-লিয়াঙের তুলির কাজ। তখন পেয়াদাদের হুকুম দিল—মা-লিয়াংকে মেরে তার তুলি নিয়ে এসো।

জাঁদরেল লোকগুলো ঘরে ঢুকে দেখে কোথায় কে? মা-লিয়াং পালিয়েছে। দেয়ালের গায়ে একটা মই লাগানো। মই বেয়ে উঠতে গিয়ে জমিদার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে দেখে মইটি হাওয়া।

মা-লিয়াং দেখল গাঁয়ে থাকা ঠিক হবে না। যার বাড়িতে সে লুকোবে সে মুশকিলে পড়বে। কাজেই ঠিক করল অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। এই ভেবে মা-লিয়াং গ্রাম থেকে বিদায় নিল।

তারপর একটা স্থন্দর ঘোড়া এঁকে তার পিঠে চেপে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

খানিকদূর গিয়ে মা-লিয়াং পেছনে তাকিয়ে দেখে জন-বিশেক লোক নিয়ে জমিদার ঘোড়ায় ক'রে তার পিছু নিয়েছে। তাদের হাতে মশাল আর জমিদারের হাতে ঝকঝকে তলোয়ার।

তারা কাছে এসে পড়েছে। মা-লিয়াং চট ক'রে একটা তীরধনুক এঁকে নিয়ে তীর ছুঁড়ল। তীর জমিদারের গলায় বিঁধল। জমিদার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। তারপর মা-লিয়াং নিজের ঘোড়ায় চাবুক মেরে সাঁ সাঁ ক'রে পালিয়ে গেল।

দিন যায়, রাত যায়, মা-লিয়াং থামে না। তারপর এক শহরে এসে সেখানে থাকবে ঠিক করল। অনেক, অনেক দূরে তার গ্রাম। শহরে কী আর করবে, পেট চালাবার জন্যে ছবি আঁকতে লাগল। যাতে ছবিগুলো প্রাণ না পায়, তার জন্যে পাখি আঁকে ঠোঁট বাদ দিয়ে, জন্তু আঁকে পা বাদ দিয়ে।

একদিন একটা সারস এঁকেছে তার চোখ নেই। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে তুলি থেকে এক ফোঁটা কালি মুণ্ডুর ওপর পড়তেই সারসটা উড়ে গেল। সারা শহরে তখন হৈ-হৈ কাণ্ড। সম্রাটের কানে যেতেই

মা-লিয়াঙের ডাক পড়ল। মা-লিয়াঙের যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ভয়ে আর প্রলোভনে পড়ে যেতে হল।

মা-লিয়াং শুনেছিল সম্রাট বড় নিষ্ঠুর। তাই তাকে সাংঘাতিক ঘৃণা করত। মা-লিয়াং কিছুতেই অমন লোকের কাজ করবে না। সম্রাট যখন ড্রাগন আঁকতে বলল, তখন সে কুৎসিৎ ব্যাঙ আঁকল, যখন পক্ষিরাজ আঁকতে বলল নোংরা মুরগী আঁকল। সম্রাট রেগে আগুন। সিংহাসনের চারধার তারা নোংরা দুর্গন্ধ করেছে। সম্রাট মা-লিয়াংকে ধরে জেলে পুরতে আর তুলি কেড়ে নিতে বললেন।

সম্রাট সেই তুলি নিয়ে নিজে আঁকতে চেষ্টা করলেন। প্রথমে তিনি একটি সোনার পাহাড় আঁকলেন। শেষ পর্যন্ত একটাতে খুশি না হয়ে এক সঙ্গে গুচ্ছের পাহাড় আঁকলেন। যখন আঁকা শেষ হল দেখা গেল সোনার পাহাড়গুলো পাথরের হয়ে গেছে আর শেষকালে মাথা ভারী হয়ে ভেঙে পড়ল। আরেকটু হলেই সম্রাট তার তলায় চাপা পড়ছিলেন।

কিন্তু মহারাজের লোভ প্রচণ্ড। সোনার পাহাড় আঁকতে না পেরে তাল তাল সোনা আঁকতে লাগলেন। সোনার তাল এঁকে মনে হল, বড্ড ছোট হয়েছে। আরও বড় আঁকলেন। উঁহু, ছোট হয়েছে। আরও বড় আঁকলেন। শেষ পর্যন্ত প্রকাণ্ড লম্বা সোনার তাল আঁকা হল। কিন্তু আঁকা শেষ হলে দেখা গেল সোনার তাল নয়, একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা অজগর। মহারাজা ভয়ে মূর্ছা গেলেন। লোক-লস্কর ছুটে এসে মহারাজকে বাঁচাল। নইলে অজগরটি মহারাজকে গিলে ফেলত।

তুলিটা নিজে কাজে লাগাতে না পেরে মা-লিয়াংকে মহারাজা মুক্তি দিলেন এবং অনেক মিষ্টি কথা বললেন। অনেক সোনা-দানা দিলেন আর বললেন রাজকন্যা দেবেন।

মা-লিয়াং মতলব এঁটে রেখেছিল। তক্ষুণি রাজী হল। মহারাজা খুশি হয়ে তুলি ফেরত দিলেন।

মহারাজা ভাবলেন, ও যদি বন আঁকে, তা থেকে হিংস্র বাঘভাল্লুক বেরিয়ে আসবে। তার চেয়ে সমুদ্র আঁকুক।

মা-লিয়াংকে প্রথমে বলা হল সমুদ্র আঁকতে। মা-লিয়াং তুলি দিয়ে স্পষ্ট ক'রে অপার সমুদ্র আঁকল। তার নীল স্থির জল যেন প্রকাণ্ড আয়না।

মহারাজা দেখে বললেন, 'মাছ নেই কেন?'

মা-লিয়াং তুলি ছোঁয়াতেই রংবেরং-এর মাছ দেখা দিল। তারপর পাখনা নাড়তে নাড়তে দূরে মিলিয়ে গেল।

দূরে যেতে দেখে মহারাজ বললেন, 'শিগগির নৌকো আঁকো, নৌকোয় ক'রে আমি পেছনে পেছনে যাবো।'

মা-লিয়াং প্রকাণ্ড ময়ূরপঙ্খি নৌকো আঁকল। তাতে রাজা, রাণী, রাজকন্যা, মন্ত্রীর দল চড়ে বসল। তারপর তুলির টানে বাতাস আঁকল। সমুদ্রে জল নড়ে উঠল। নৌকো চলতে লাগল।

মহারাজ দেখলেন, নৌকো বড্ড আস্তে চলছে। আরও জোরে হাওয়া দাও। আরও জোরে।

মা-লিয়াং তুলির টানে জোরে হাওয়া বইয়ে দিল। সমুদ্রে ঢেউ উঠল বড় বড়। ক্ষ্যাপা ঢেউ। নৌকো মাঝদরিয়ায় চলে গেল।

মা-লিয়াং আরও জোরে হাওয়া আঁকল। সমুদ্র গর্জে উঠল। উঁচু উঁচু ঢেউ। নৌকো দুলছে।

মহারাজা গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'আর নয়। খুব হয়েছে। আর নয়।'

মা-লিয়াং তাতে কান দিল না। তুলি চলতে লাগল। সমুদ্র ক্ষেপে উঠেছে। নৌকোয় জল উঠল।

মহারাজার সারা গায়ে জল। মা-লিয়াংকে তিনি ঘুসি উঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন।

মা-লিয়াং যেন শুনতেই পাচ্ছে না। দমকা বাতাস আঁকছে। আকাশ কালো ক'রে ঝড়ো মেঘ ছুটে এল। নৌকোর ওপর একের

পর এক ক্ষুব্ধ ঢেউ ভেঙে পড়ছে। নৌকো ভেঙে চুরমার হয়ে ডুবে গেল। রাজা মন্ত্রী সবাই তলিয়ে গেল সমুদ্রে।

মহারাজার মৃত্যুর পর মা-লিয়াং আর তার জাদুকর তুলির গল্প সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মা-লিয়াংয়ের যে কি হল কেউ ঠিক জানে না।

কেউ বলে সে তার নিজের গ্রামে তার চাষী-ভাইদের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

অন্যেরা বলে সে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গরীবদের জন্যে ছবি এঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আকাদেমী পুরস্কার বিজয়ী এবং শ্রেষ্ঠ কবি-সম্মানে ভূষিত কবি ও সুসাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'রূপকথার ঝুড়ি'তে আছে বিভিন্ন দেশ বিদেশের রূপকথা দিয়ে সাজানো দেড় ডজন গল্প। শুধুমাত্র রাজা রাণী'র কথাই নয়, মাছি, কাঁকড়া, ছারপোকা, পতঙ্গ এমনকি ভূতের দলের গল্প দিয়ে ভরপুর চমকপ্রদ এই ঝুড়ি। সব কটি গল্পের সঙ্গে আছে মজার মজার সব ছবি।

১৫ টাকা

ISBN 0 86131 907 9

ওরিয়েন্ট লংম্যান